৬.১০ গর্জিলা ও দস্যু বনহুর – Bangla Library

৬.১০ গর্জিলা ও দস্যু বনহুর – Bangla Library

গর্জিলা ও দস্যু বনহুর–৯০

বনহুর একটা সুইচে চাপ দিতেই সমস্ত বাগানবাড়ি আলোকিত হয়ে উঠলো, প্রথমে নীল তারপর ধীরে ধীরে লালচে, কেমন যেন এক ভীতিকর আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

বিস্ময় নিয়ে দেখলেন মিঃ কিবরিয়া, মিঃ আহমদ আলী এবং অন্য সকলে। জামাল সাহেব তো হতভম্ব হয়ে গেছেন। তিনি ভাবতেও পারেন নি তাদের বাড়ির তলায় রয়েছে এমন গভীর এক রহস্য।

বনহুর অপর এক সুইচে চাপ দিতেই আলোকরশি ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। একটা জমাট– অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসে বাগানবাড়ির গাছগুলো।

মনে হয় যেন এক একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে। মাথা উঁচু করে।

বনহুর বললো–এই সুইচগুলো দ্বারা সৃষ্টি হতো বাগানবাড়ির রং–এর খেলা বা ভৌতিক আলোকরশি। একটু থেমে বললো–এই আলোকরশ্মি ছিলো একটা সংকেত। এই সংকেত দ্বারা খোন্দকার আবদুল্লাহ তার সেই দক্ষ নিগ্রো অনুচরটাকে আহ্বান জানাতেন এবং এই আলোকরশ্মির পিছনে রয়েছে গভীর রহস্য।

এবার বনহুর অপর এক সুইচে চাপ দিতেই গাছের গুঁড়ির নিচের অংশে একটা গর্তের মুখ বেরিয়ে এলো। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো গর্তটা একটা সুড়ঙ্গমুখ। বনহুর বললো–আসুন আপনারা।

বনহুর টর্চলাইট হাতে সুড়ঙ্গ মধ্যে নেমে চললো। তাকে অনুসরণ করলেন মিঃ কিবরিয়া, মিঃ আহমদ আলী এবং জামাল সাহেব।

কামাল তাকিয়ে আছে স্থিরদৃষ্টি মেলে। তার পাগলামি যেন অনেকটা কমে এসেছে। আশ্চর্য চোখে দেখছে সে।

বললো বনহুর কামাল সাহেব, আপনিও আসুন।

এ্যা, আমি…আমি যাবোর কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?

জামাল সাহেব কামালের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন বড় ভাইয়ের কাছে। ওরে চল, আমাদের বড় ভাইয়া আছেন সেখানে।

কোথা?

সব দেখতে পাবি, চল আমাদের সঙ্গে। জামাল সাহেব কামালের হাত ধরে নিয়ে চললেন।

সোজা সুড়ঙ্গপথ।

আশ্চর্য সিঁড়ির ধাপগুলো।

বাগানবাড়ির তলদেশে নেমে গেছে যেন একটা পরিস্কার–পথ। বেশ কিছুদূর এগুনোর পর একটা প্রশস্ত জায়গা, তারপর কয়েকটা দরজা। বনহুর একটা

দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো।

সবাই অবাক হয়ে দেখলো, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে কয়েকজন লোক। তাদের দেখলে সহসা চেনা মুস্কিল।

বনহুর আলো ফেললো মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলোর উপর।

জামাল সাহেব প্রায় চিৎকার করে উঠলেন–কালু দারোয়ান, তুই এখানে? পরক্ষণেই অপরদের দেখে বললেন–রহিম, দীনু, হাজরা খাতুন তোমরা সবাই এখানে? কে, কে তোমাদের সবাইকে এখানে এনে বন্দী করে রেখেছে।

জবাব দিলো কালু দারওয়ান–মেজো সাহেব, সব করেছেন সেজো সাহেব.......

আবদুল্লাহ তোমাদের সবাইকে.......

হাঁ, আমাদের সবাইকে তিনি হাত-পা–মুখ বেঁধে গভীর রাতে পুকুরের ঘাটে এনে একটা বাক্সের মধ্যে তুলে তারপর নিয়ে এসেছেন। আমরা জানি না এখন কোথায় আছি। মেজো সাহেব, আপনি এসেছেন, এনারা এসেছেন কিন্তু কি করে এলেন?

কেমন করে আমরা এসেছি, সব পরে জানতে পারবে তোমরা। বলল কালু, বড় ভাইয়া কোথায়?

কালু মিয়া কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠে বনহুর–কালু মিয়া কিছু জানে না। সে বশী, আসুন বড়ভাইয়াকে দেখতে পাবেন।

বনহুর সবার আগে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর সবাই তাকে অনুসরণ করছেন।

রীনা ছিল সবার শেষে। মিঃ আলম তাকে লক্ষ্য করে কোনো কথা বলছে না, তাই সে মনে মনে অভিমান করেছে।

অবশ্য রহমান ঠিক রীনার পাশে পাশেই আছে। রীনার যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। তবু রীনার মনে অভিমান গুমড়ে উঠেছে,

কেন মিঃ আলম ভুলু চাকরের বেশে তাকে এতদিন এমন ধোকা দিয়ে এসেছে, কেন তাকে জানাননি তার আসল পরিচয়।

বনহুর সবাইকে নিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলো, সম্মুখে একটা অন্ধকার কক্ষ দেখতে পেলো। সেই কক্ষে প্রবেশ করে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলো তারা। দেখতে পেলো একটা বিরাট চাকার মত কিছু ধীরে ধীরে ঘুরছে, সম্মুখে হাত-পা শিকলে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন খোন্দকার খবির সাহেব। মুখে তার একমুখ দাড়ি জন্মেছে, চোখ ঘোলাটে, চুলে জটা ধরে গেছে।

জামাল সাহেব খবির সাহেবকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন–ভাইয়া, তোমার এর অবস্থা কেন? ভাইয়া–ভাইয়া..

খোন্দকার খবির সাহেব প্রথমে যেন হতবাক হয়ে পড়েন, তিনি বুঝতে পারেন না এরা কারা, আর কেমন করেই বা এখানে আসতে সক্ষম হয়েছেন। কিছুক্ষণ সময় লাগলো তার নিজকে প্রকৃতিস্থ করতে, তারপর বললেন তিনি–জামাল, তুই…তুই এসেছিস এখানে?

হাঁ ভাইয়া, শুধু আমি নই, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ কিবরিয়া, পুলিশ গোয়েন্দা প্রধান মিঃ আহমদ আলী, আরও এসেছে। ডিটেকটিভ মিঃ আলম। মিঃ আলমই তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে খোন্দকার বাড়ির গভীর রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তারই সহায়তায় আমরা খোন্দকার বাড়ির তলদেশে আসতে পেরেছি, এই যে ইনি মিঃ আলম।

খোন্দকার খবির সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, তার পা দু'খানা টলছিলো–কতদিন স্নান–আহার হয়নি! তিনি উঠে দাঁড়াতেই তার হাতের বাধন খুলে দিলেন জামাল সাহেব নিজে। পা দু'খানাও মুক্ত হলো।

খবির সাহেব মিঃ আলমকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না মিঃ আলম। আপনি বাঁচালেন আমাদের……।

মিঃ আলম মানে বনহুর বললো–ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই খোন্দকার সাহেব। আপনাদের বাড়ির গভীর রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি, তার জন্য আমি খোদার কাছে হাজার শুকরিয়া করছি, কারণ এ কাজ অত্যন্ত জটিল এবং রহস্যপূর্ণ ছিলো। আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয়েছে। আজ আমি

আনন্দিত–আপনাদের মানে খোন্দকার বাড়িতে পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলাম!

বনহুর এবার সবাইকে সঙ্গে করে আরও একটু এগিয়ে একটা কক্ষের মত জায়গায় এসে হাজির হলো। সেখানে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি কলকজ্বা রয়েছে। বনহুর একটা হ্যান্ডেল ঘুরাতে লাগলো, ধীরে ধীরে একটা লিফটের মত বাক্স নেমে এলো। বনহুর একটা চাবিতে চাপ দিতেই বাক্সের ঢাকনা ফাঁক হয়ে গেলো। বনহুর বললো–আপনারা তিনজন উঠে বসুন। এই বাক্সে তিনজন চেপে উপরে যেতে পারবেন। এই বাক্সই পুকুরের গভীর অতলে আলো জাগাতো, জাগাতো তর্জন গর্জন। খোন্দকার আবদুল্লাহ সাহেব একা আপনাদের বিশাল বিষয়–সম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য এসব চক্রান্ত করেছেন।

খবির সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন–ভাই হয়ে আবদুল্লাহ যে আমাদের জীবননাশের চেষ্টা করবে, এ কথা আর কোনোদিন ভাবতেও পারিনি, আবদুল্লাহ কোথায়, তাকে আমি পুলিশের হাতে দেবো। পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবো…

জামাল সাহেব বলে উঠেন–হাইয়া, পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে হবে না। পুলিশ তাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

আবদুল্লাহ তাহলে…..

হাঁ, তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, আর সে খোন্দকার বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না। কথাগুলো বললো স্বয়ং দস্যু বনহুর।

সবাই এক সময় ফিরে এলেন খোন্দকার বাড়ির গভীর রহস্যের তলদেশ থেকে পৃথিবীর বুকে।

খোন্দকার বাড়িতে আনন্দোৎসব শুরু হলো।

বড় ভাইয়াকে ফিরে পেয়ে কামালের খুশি আর ধরে না, সে খোন্দকার খবির সাহেবকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। তার পাগলামি আর রইলো না।

নেহালের অবস্থা এখন ভাল।

সেও কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলো।

নেহালের সংজ্ঞা ফিরে আসার পর সে পুলিশকে জানিয়েছিলো আলখেল্লাধারী কোনো এক ব্যক্তি তাকে ছোরা দিয়ে আঘাত করেছিলো। সেই আলখেল্লাধারী ব্যক্তিই যে খোন্দকার আবদুল্লাহ তাতে কোনো ভুল নেই।

খোন্দকার বাড়ির শান্তি অন্তর্হিত হয়েছিলো, এখন আবার ফিরে এলো অনাবিল শান্তি। সবার মুখেই হাসি খুশি আর আনন্দোচ্ছ্বাস।

খোন্দকার জামাল সাহেব একটা উৎসবের আয়োজন করলেন।

সে উৎসবে থাকবেন ফাংহার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, থাকবেন ফাংহা পুলিশ অফিসারগণ আর থাকবেন মিঃ আলম, মিঃ রহমান আর রীনা।

সেদিনের অভিমান কিন্তু রীনার মন থেকে সরেনি। কেন ভুলু সেজে এতদিন মিঃ আলম সর কাছে আত্নগোপন করে এসেছেন—এটাই হলো তার অভিমানের কারণ।

এক সময় বললো রীনা—মিঃ আলম, আপনি বড় মিথ্যাবাদী.......আমাকে আপনি ধোকা দিয়ে এসেছেন। কেন আমার কাছে নিজকে এভাবে গোপন রেখেছিলেন বলুন তো?

একটু হেসে বললো বনহুর—শুধু আপনার কাছেই নয়, আমার বন্ধু রহমানকেও আমি আমার আসল পরিচয় জানাইনি।

এটা আপনি ভুল করেছেন এবং সে কারণে অনেক কষ্টও আপনাকে পেতে হয়েছে, কারণ ঠিকমত আহার পান নি, ঠিকমত শয্যা পান নি, এমন কি সব সময় গালমন্দ শুনেছেন।

বনহুর পূর্বের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো—ও দুঃখ—কষ্ট—গালমন্দই তো আমাকে আমার কাজে এতদূর এগুতে সহায়তা করেছিলো। নইলে আমি কোনোদিনই খোন্দকার বাড়ির গভীর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হতাম না। মিস রীনা, আপনি জানেন না কত সাবধানে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। হাঁ, খোকার বাড়ির একজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু তাকে আর পরে খুঁজে পাইনি।

বললো রীনা–কে তিনি?

সে হলো খোন্দকার বাড়ির পুরোন চাকর রবিউল্লা। কিন্তু তাকে আমি পরে আর খুঁজে পাইনি। সত্যি ওর সহায়তা না পেলে আমি হয়তো এ কাজে বিমুখ হতাম। রবিউল্লার কাছে আমি প্রতিরাতে যেতাম গাঁজা টানতে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তার কাছে থোকার বাড়ির সবকিছু জেনে নেওয়া। রবিউল্লা ঠিকই আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছে, সে সব কিছু জানাতে পেরেছিলো যা থেকে আমি খোন্দকার বাড়ির গভীর রহস্যের সূত্র খুঁজে পেয়েছি।

বনহুর সত্যিই রবিউল্লাকে খুঁজে পায়নি, কারণ যখন রবিউল্লাহ দেখলো ভুলু আসলে রীনাদের বাড়ির চাকর নয়, সে একজন ভদ্রব্যক্তি তখন সে আলগোছে সরে পড়েছিলো সেখান থেকে। লজ্জায় তার মাথা কাটা যাচ্ছিলো, ভুলুকে তার সমকক্ষ মনে করে কত কিনা বলেছে রবিউল্লা, তাই সে সরে পড়ে লজ্জা শরমে।

রীনা বললো–সত্যিই কি আপনি গাঁজা টানতেন মিঃ আলম?

সিগারেট থেকে একমুখ ধোয়া ছেড়ে বলে বনহুরগাঁজা টানতাম ঠিক কিন্তু আসলে আমি গলধঃকরণ করতাম না, শুধু–মুখ গহ্বর নিয়ে ছুঁড়ে বের করে ফেলতাম, তাই নেশা হতো না বা আমি কোনো রকম অসুস্থ বোধ করতাম না।

রীনার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

জীবনে সে বহু লোককে দেখেছে কিন্তু এমন ব্যক্তি রীনা দেখেনি, যাকে প্রাণভরে দেখলেও আরও দেখতে ইচ্ছে করে–আরও অবাক লাগে, বিস্ময় জাগে মনে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো বনহুর–মিস রীনা, ফাংহার কাজ আমার শেষ হয়েছে। এবার আমাকে ফিরে যেতে হবে স্বদেশে। আপনি বলেছিলেন আপনার ছোট বোন আছে, নাম তার মীনা।

হাঁ, ঐ একটিমাত্র বোনই আছে আমার এ পৃথিবীতে, আর কেউ নেই। ওর নাম মীনাই বটে…

মিস রীনা, আপনি নিশ্চয়ই বোনকে বহুদিন দেখেননি।

হাঁ, দেখিনি।

তাহলে চলুন আপনাকে আপনার বোনের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। কোথায় থাকে সে?

আমাকে বোনের কাছে পৌঁছে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন এবং রেহাই পাবেন বিরাট এক দুশ্চিন্তা থেকে, তাই না?

যদি আপনাকে আপনার আপন জনের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে দুশ্চিন্তা দূর হবে বৈকি। মিস রীনা, জীবনে যাতে আপনি কোনো অসুবিধায় না পড়েন বা কোনো অসুবিধা আপনার না হয় সে ব্যবস্থা আমি করবো।

যা দয়া করেছেন তাই আমার মত নগণ্যা এক নারীর জন্য যথেষ্ট। আর করুণা চাই না......

আপনি অহেতুক অভিমান করছেন মিস রীনা। আমি আপনাকে দয়া বা করুণা কিছুই করিনি। আমার যা কর্তব্য আমি তাই করেছি মাত্র। আপনাকে আপনার আত্নীয়স্বজনের কাছে পৌঁছে দেওয়াও আমার কর্তব্য, তাই বলছি......

বেশ, আমি একাই যেতে পারবো। ফাংহা থেকে বেশি দূর নয় যেখানে আমার বোন মীনা থাকে। মাত্র তিনদিন দু'রাত জাহাজে কাটাতে হবে, এই যা।

বলেন কি মিস রীনা, আপনার বোন যে দেশে বা যে জায়গায় আছে সেখানে যেতে তিনদিন আর দু'রাত লেগে যায়!

হা মিঃ আলম, তাই লাগে।

বেশ, আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো, কিন্তু নীল সাগরের তলে গিয়ে আপনার প্রয়োজনমত অর্থ এবং সোনাদানা যা দরকার নিয়ে তারপর যাবেন।

নীল সাগরতলে?

হাঁ, আপনি যাবেন সেখানে।

কিন্তু......

আমিই আপনাকে নিয়ে যাবো।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে রীনার মুখমন্ডল।

এক সময় রহমানকে ডেকে বনহুর বলেরহমান, তুমি কান্দাই ফিরে যাও। ফুল্লরার সন্ধান করো গে। আমি রীনাকে তার আত্নীয়ার কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবো।

তাই হবে সর্দার।

রহমান পরদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর রীণাকে নিয়ে হিরন্ময়ের সেই গোপন ঘাটিতে এলো, যেখানে রয়েছে সেই সাবমেরিন বা ডুবো স্পীড বোট।

বনহুর রীনাকে কিছু খাবার সঙ্গে নিতে বলেছিলো। রীনা বনহুরের কথামত কিছু খাবার নিলো সঙ্গে। ডুবো স্পীড বোটে বসে রীনার মন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো। একদিন এই ডুবো স্পীড বোটে করে হিরন্ময় তাকে নীল সাগরতলে হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলো, এখন সেখানে যাচ্ছে তারা প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সোনাদানা আনতে।

হাজার হলেও তো রীনা নারী। নারীমন বড় সৌখিন হয়। রীনার মন খুশিতে ভরে উঠে, যত খুশি আজ সে নেবে নীল সাগর তলের রত্নগুহা থেকে! তাছাড়া বড় আনন্দ মিঃ আলম তার সঙ্গে রয়েছে।

সাবমেরিনের মধ্যে প্রবেশ করে হুক আটকে দেবার পূর্বে অক্সিজেন পাইপ সহ মাক্স মুখে পুরে নিলো বনহুর আর রীনা।

এবার তাদের ডুবো স্পীড বোট পানির অতলে তলিয়ে গেলো।

বনহুর দক্ষ চালক হিসেবে কাজ করে চললো।

ডুবো স্পীড বোটের সম্মুখভাগে কাঁচের আবরণ ছিলো তাই সাগরতলের সবকিছু স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো। কত ডুবো পাহাড়, কত উদ্ভিদ, কত জীব রয়েছে যা কোনোদিন দেখেনি রীনা। দু'চোখে ওর বিস্ময়।

হিরন্ময় তাকে নিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু সে যাওয়া ছিলো আলাদা। তাকে বুঝতে দেয়নি হিরন্ময় কোথা দিয়ে কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে সে।

আজ রীনা স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে সাগর তলের সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে থাকে।

কত রকম বিস্ময়কর উদ্ভিদঠিক এক একটা জীব বা জন্তুর মত মনে হচ্ছিলো। কতকগুলো ঠিক মাথার চুলের মত বিরাট বিরাট লম্বা আকার।

কতকগুলো উদ্ভিদ ঠিক মাছের মত কিন্তু আসলে মাছ নয়, তবু ভেসে বেড়াচ্ছে সাগরতলে!

আবার মাছগুলোও অদ্ভুত ধরনের।

কোনো মাছ ঠিক ড্রাম বা জ্বালার মত দেখতে। সাগরতলে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। সম্মুখে গোল গোল দুটি চোখ, মাঝে মাঝে বিরাট হা করছে তাই বোঝা যায় সেগুলো কোনো জীব বা মাছ, নইলে ড্রাম বা জ্বালা বললেই ভুল হতো। আবার কতকগুলো মাছ আছে, দেখলে মনে হয় যেন এক একটা বিছানার চাদর। ধবধবে সাদা, দুপাশে দুটো ক্ষুদে চোখ আর লেজ আছে, আর আছে পালক জাতীয় দু'পাশে সাঁতার কাটার হাতল, যেন এক একটা বৈঠা।

রীনা দেখছিলো এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলো–মিঃ আলম, ওটা কি? ওটা এমন কেন? ওটা ওর চোখ বুঝি…এমনি কত কথা।

কতকগুলো মাছ ঠিক সাপের মত, আসলে সাপ নয়। কতকগুলো ঠিক বলের মত গোলাকার কিন্তু আকার বিরাট। বলের গায়ে দুটো ফুটো দু'পাশে। বল মাছের চোখ ও দুটো কান আছে, চাকতির মত লেগে আছে বলের গায়ে।

ডুবো স্পীড বোট বেগে না চালিয়ে একটু ধীরে চাকতির মত লেগে আছে বলের গায়ে।

ডুবো স্পীড বোট বেগে না চালিয়ে একটু ধীরে চালাচ্ছিলো বনহুর? তবু ঘন্টায় কম পক্ষে দুশ মাইল বেগে চলছিলো।

মাঝে মাঝে যখন ধীরে চলছিলো তখন এসব দৃশ্য এবং জল জীবগুলো স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো তাদের। কিছুটা এগুতেই একটা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে সাবমেরিন বা ডুবো স্পীড বোট থেমে পড়লো, কারণ একটা অদ্ভুত জীব নজরে পড়লো। জীবটা ঠিক কুমিরের মত কিন্তু কুমির নয়।

বনহুর বললো–রীনা, সর্বনাশ হয়েছে, আমরা হাঙ্গরের কবলে পড়লাম।

হাঙ্গর?

হাঁ, ঐ যে জীবটা দেখছেন ওটা হাঙ্গর। সমুদ্রে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জীব।

বনহুরের কথা শেষ হয় না, হাঙ্গরটা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয়, তারপর ভীষণষ্টাবে এ যে আসতে থাকে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সাবমেরিনে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যথাসম্ভব স্পীড বাড়িয়ে দেয়। সাগরতলে জল্যানটা তীরবেগে ছুটতে থাকে।

হাঙ্গরটাও ছুটতে থাকে সাবমেরিন লক্ষ্য করে কিন্তু বেশিক্ষণ এগুতে পারে না, তাল কেটে পিছিয়ে পড়ে হাঙ্গরটা।

বনহুর বলে উঠলো মিস রীনা, বেঁচে গেলাম। নীল সাগরের হাঙ্গরগুলো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এরা জাহাজ দেখলেও আক্রমণ করে।

এরপর তেমন কোনো বিপদ আর এলো না।

নীল সাগরের তলে রসগুহায় পৌঁছে গেলো তারা এক সময়।

এখন এ রত্নগুলো স্বয়ং দস্যু বনহুরের করায়ত্ত। সে–ই শুধু এ রত্নগুহার পথের সন্ধান জানে!

গুহায় প্রবেশ করে বলে বনহুর–মিস রীনা, যত খুশি নিন যা আপনার প্রয়োজন।

রীনা বলে–ত্ব আর অর্থ এ সবে আমার কোনো মোহ নেই মিঃ আলম।

কিন্তু প্রয়োজনকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না মিস রীনা। দীর্ঘকাল আপনাকে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে হবে, কাজেই.......

মিস রীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে–আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চিরতরে বিদায় হয়েছে মিঃ আলম। আমি জানি কোনোদিন আর ফিরে পাবো না আমার সে জীবন!

হঠাৎ এসব কথা কেন রীনা? আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি যা আপনাদের প্রয়োজনে লাগবে। কথাটা বলে বনহুর একটা থলের মধ্যে ভর্তি করে দিলো টাকা আর সোনাদানা যা হলে রীনার তিন পুরুষ চাল চলে যাবে।

বললো বনহুর–মিস রীনা, নিন বলছি!

আপনি নেবেন না!

আমার প্রয়োজন হবে না, তবে যখন ফাংহাবাসীদের কোনো অভাব আসবে তখন নেবো, এখন এই। নীল সাগরতলেই থাক।

সত্যি, আপনি অপূর্ব মিঃ আলম!

একটু হাসালো বনহুর, বড় সুন্দর সে হাসি, বললো–চলুন এবার যাওয়া যাক।

আর একটু দেরী করুন না মিঃ আলম, চলুন রত্নাগুহার সবকিছু আজ ঘুরেফিরে দেখি।

চলুন।

বনহুর আর রীনা রতুগুহার সবকিছু ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো, হিরন্ময়ের সঙ্গে রীনা রর গুহায় এসেছিলো কিন্তু এমনভাবে সে দেখতে পায়নি কিন্তু।

আজ রীনা যতই দেখছে ততই রহগুহা দেখার সাধ বাড়ছে। শয়তান হিরন্ময় কৌশলে গভীর পানির নিচে কিভাবে গুহা তৈরি করেছিলো এবং সেখানে সে গোপনে কোটি কোটি টাকা আর সোনা–দানা ধনরত্ন জমা করেছিলো, কিভাবে সমুদ্রের ভীষণ জলরাশিকে প্রতিরোধ করেছিলো হিরন্ময়, সত্যিই যেন বিস্ময়কর।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর–আর বিলম্ব করা উচিত হবে না মিস রীনা, চলুন যাওয়া। যাক।

কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করছে না মিঃ আলম। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর কোলাহল থেকে এখানে বেশ আছি। মিঃ আলম……

বলুন?

আপনার কেমন লাগছে?

মন্দ না, তবে অনেক কাজ আছে কিনা, তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। শুধু আপনার কাজ আর কাজ। কাজ ছাড়া আপনার যেন আর কোনো কিছু নেই।

পৃথিবীতে মানুষের জন্যই তো কাজ নিয়ে। মানুষ কাজের মধ্যে বেঁচে আছে।

বিশাল বিশ্বে অসংখ্য ভীড়ের মাঝে কে কার মনে রয়

শুধু বেঁচে থাকে তার কাজ

অনন্ত কালের স্বাক্ষর হয়ে নাহি তার ক্ষয়।

আপনি তো সুন্দর কবিতা জানেন মিঃ আলম।

কেন, আমি মানুষ না?

মানুষ সত্যি কিন্তু মানুষ হলেই কি সবাই কবিতা লিখতে বা পড়তে পারে?

কবি হওয়া চাই, তাই না?

আপনি অসাধারণ, তাই আপনার অসাধ্য কিছু নেই। সত্যি আপনার কবিতাটা নিতান্ত সত্য। এই পৃথিবীতে অগণিত মানুষের ভীড়ে কত মানুষ আসছে আর যাচ্ছে কিন্তু ক'জন মানুষকে ক'জন মনে রাখে। যারা কাজের মত কাজ করে যায় তারাই শুধু মানুষের স্মরণীয় হয়ে থাকে তাদের কাজের মাধ্যমে।

হাঁ মিস রীনা, তাই সত্য।

তাই আপনি শুধু কাজ আর কাজ নিয়েই থাকতে চান.......

তবে স্মরণীয় হয়ে থাকবার জন্য নয় মিস রীনা। আমি চাই নিপীড়িত মানুষ যেন মানুষের কাছে দলিত মথিত লাঞ্ছিত না হয়।

মানুষের জন্য আপনার কত চিন্তা। আমি আপনার সম্বন্ধে রহমান সাহেবের কাছে সব শুনেছি। আপনি নিজের জন্য একটুও ভাবেন না, আপনার ভাবনা শুধু পরের জন্য। যেমন আমি...আমাকে নিয়ে আপনি ভাবছেন, কেমন করে আমি আমার আপনজনের কাছে গিয়ে নিশ্চিন্তে কাল কাটাতে পারবো, কেমন করে আমি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করতে পারবো......

থাক, আর বলতে হবে না মিস রীনা। নীল সাগতলের রত্নগুহা দেখার সাধ মিটেছে?

হা মিটেছে। হিরন্ময় আমাকে এই রত্নগুহায় নীলকমল বানাতে চেয়েছিলো। সত্যি সেদিন আপনি না উদ্ধার করলে আজ আমার কঙ্কালটা ঠিক ডাকবাংলোর মালির মেয়ে ঝুমার মত পড়ে থাকতে এই গুহার মেঝেতে।

বেশি ভাবছেন মিস রীনা।

না, যা সত্য তাই বলছি। মিঃ আলম, আপনি আমার জীবনরক্ষক, আপনি,

চলুন ফেরা যাক মিস রীনা।

এ্যা......আচ্ছা চলুন।

বনহুর আর রীনা পা বাড়ালো জলযানটার দিকে।

*

জলযান থেকে তারা নামলো সাগরতীরে। হিরন্ময়ের গোপন আস্তানার এক নিভৃত স্থানে। একদিন এই আস্তানা বা আড্ডাখানা ছিলো সরগরম। দুষ্ট কুচক্রীদের অফিস আর গুদামঘর। আজ বনহগুর সেই কুচক্রীদের নিঃশেষ করে দিয়েছে, নিঃশেষ করে দিয়েছে তাদের সবকিছু! তাদের আস্তানা আজ পোড়াবাড়ির মত নিস্তব্ধ।

ফাংহা সমুদ্র তীরে পর্বতমালার পাদমূলে ছিলো এই আস্তানা। তাই বাইরের লোকজনের দৃষ্টির অন্তরালে ছিলো, কেউ কোনোদিন বা কোনো সময় টের পেতো না। তাছাড়া লোকালয়ের বাইরেই ধরা যায় এই জায়গাটা।

আশেপাশে কোনো যানবাহন বা জাহাজ ঘাটি ছিলো না। সমুদ্রের কোল ঘেষে ফাংহা পর্বতমালা। একপাশে গভীর জঙ্গল। তাই শয়তানহিরন্ময় তার গোপন ঘাটির জন্য বেছে নিয়েছিলো।

বনহুর আর রীনা নেমে দাঁড়াতেই তাদের কাছে পৌঁছলো এক অদ্ভুত শব্দ। কোনো জানোয়ারের গলার আওয়াজ বুঝতে পারলো বনহুর। বললো সে–মিস রীনা, এ শব্দ হিংস্র কোনো জানোয়ারের কণ্ঠস্বর। পা চালিয়ে চলুন হিরন্ময়ের কোনো গোপন কক্ষে গিয়ে আত্নরক্ষা করি।

রীনা সেই মুহূর্তে বনহুরের পিছনে পর্বতমালার দিকে লক্ষ্য করে আর্তচিৎকার করে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালো বনহুর, মুহূর্তে বনহুরের চক্ষুস্থির হয়ে গেলো। এত ভীষণ আকার জন্তু সে একমাত্র কিউঁকিলা ছাড়া আর কখনেও দেখেনি। পর্বতমালার উপর দিয়ে মাথা তুলে দিয়েছে জটা। চোখ দুটো ঠিক আগুনের গোলার মত। দাঁতগুলো বিরাট আকার, মুখখানা কতকটা ঠিক কুমিরের মত লাগলো। জন্তুটা হা করতেই তার মুখ গহ্বর থেকে আগুন বেরিয়ে পড়লো।

বনহুর রীনাকে দ্রুতহস্তে টেনে নিলো কাছে, তারপর ব্যস্ততার সঙ্গে বললো–গর্জিলা.......মিস রীনা, এটা গর্জিলা, তাড়াতাড়ি চলুন, নইলে ওর নিঃশ্বাসে আমরা ঝলসে যাবো.........

রীনা বললো–চলুন, চলুন মিঃ আলম!

বনহুর আর রীনা কোনো নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করলো।

ওদিকে গর্জিলা পর্বত ডিংগিয়ে অল্পক্ষণেই পার হয়ে এলো এখানে। সে বোধ হয় দেখতে পেরেছে। বনহুর আর রীনাকে। বিরাট বিরাট পা ফেলে অল্পক্ষণেই এসে পড়লো গর্জিলা মহারাজ।

ততক্ষণে বনহুর আর রীনা লুকিয়ে পড়েছে হিরন্ময় বাবুর তৈরি গোয়েন্দা কক্ষে।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে রীনা।

বনহুরও হাঁপিয়ে পড়েছে বেশ কিছুটা।

গর্জিলার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আশেপাশে গাছপালা আর পাথরগুলো ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে।

ভয়ে রীনা কুকুড়ে গেছে একেবারে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজার সম্মুখে গর্জিলার একখানা পা নজরে পড়লো। ঐ পায়ের একখানা যদি তাদের কক্ষের ছাদে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই, ছাদ সহ যে পিষে মরবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রীনা লুকিয়ে পড়লো বনহুরের পিছনে।

কিন্তু ঐ সময় গর্জিলা তার একখানা পা তুলে দিলো সেই কক্ষের ছাদে।

সঙ্গে সঙ্গে ছাদ সহ গর্জিলার পা–খানা এসে পড়লো কক্ষের মেঝেতে।

ভাগ্যিস, বনহুর আর রীনা এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাই রক্ষা নইলে ছাদের তলায় পিষে মরতো তাতে কোনো ভুল নেই। রীনা কিন্তু তার অর্থ আর সোদানার পুঁটলিটা এখনও বগলে চেপে ধরে রেখেছে।

বনহুর বললো–মিস রীনা, এখানে আর একদন্ড বিলম্ব করা উচিত নয়, শীঘ্র সরে পড়া যাক।

তাই চলুন মিঃ আলম। হায় এবার বুঝি আর রক্ষা নেই। কেন এসেছিলাম আমরা.......

বনহুর বললো–এখন সে কথা ভেবে কোনো লাভ নেই মিস রীনা। তাড়াতাড়ি চলে আসুন......বনহুর রীনার হাত ধরে এক রকম প্রায় টেনে নিয়েই চললো।

একটা গোপনপথ ধরে তারা অপর এক বড় কক্ষে প্রবেশ করলো।

কিন্তু সে কক্ষটা ঐ সময় কেঁপে দুলে উঠলো।

বনহুর রীনাকে নিয়ে দ্রুতবেগে দরজা দিয়ে বাইরে চলে এলো। গর্জিলার পা–খানা এসে পড়লো কক্ষটার ছাদের উপর। গোটা ছাদখানা তাদের চোখের সম্মুখে ধসে পড়লো।

এখন কোথায় আত্মগোপন করবে তারা।

বনহুর আর রীনা ছুটতে লাগলো।

বিরাট বিরাট গাছপালা, ভেঙে পড়ছে গর্জিলার পায়ের তলায়। মাঝে মাঝে হা করছে গর্জিলা আর। আগুন বেরিয়ে আসছে লাগলো তার মুখগহ্বর থেকে।

গর্জিলা দু'পায়ে ভর করে হাটছে।

সমুখের পা দু'খানা উঁচু হয়ে আছে তার বুকের কাছে।

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে রীনা আর বনহুর।

বনহুর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখখানা মুছে নিলো। রীনার অবস্থায় আত্মগোপন করবে গর্জিলার কবল থেকে রক্ষা পাবে, এই ভাবনা বেশি বিচলিত করলো বনহুরকে।

ওরা যখন গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলো তখন গর্জিলা খুঁজে চলেছে সেই মানুষ পোকা দুটিকে। গর্জিলার বিরাট বিশাল দেহের কাছে বনহুর আর রীনা পোকাই বটে।

গর্জিলা তছনছ করে ফেলে হিরন্ময়ের সেই গোপন ঘাটিটা। ছাদগুলো থেকে লোহার রড তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় একপাশে। বড় বড় পাথর তুলে নিয়ে ফেলে দেয় সমুদ্রের পানিতে।

রীনা থরথরিয়ে কাঁপছে।

বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে রীনা–আমার বড় ভয় করছে মিঃ আলম, হয়তো গর্জিলার হাত থেকে রক্ষা পাবো না আমরা.......

বনহুর ওকে সান্তনা দিতে পারে না, কারণ এমন এক অবস্থায় এখন তারা পৌঁছেছে যার কোনো উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে এদিক সেদিকে। কতক ফেলছে সমুদ্রের দিকে। গর্জিলাটা মাঝে মাঝে মুখ হা করে নিঃশ্বাস ফেলছে। নিঃশ্বাসে শুধু আগুনে বেরিয়ে আসছে।

বনহুর বললো–মিস রীনা, আমরা কোনোক্রমে আমাদের গাড়ির কাছে পৌঁছতে পারলে হয়তো এ যাত্রা রক্ষা পেতাম কিন্তু গাড়িখানা রয়েছে এখান থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে।

বনহুর আর রীনা যখন ফাংহা শহর থেকে নীল সাগর অভিমুখে রওনা দিয়েছিলো তখন তারা তাদের গাড়িখানা একটা টিলার পাশে রেখে গিয়েছিলো, ফিরে এসে তারা সেই গাড়িতেই শহরে আসবে।

কিন্তু সে গাড়ির কাছে যাওয়া এখন বিরাট এক সমস্যার। চারিদিকে যেন ঝড় বইছে, গর্জিলার নিঃশ্বাসে গাছপালা পুড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

আশ্চর্য, গর্জিলাটা তার মানুষ পুতুল দু'টির জন্য যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

কত করে খুঁজছে সে বনহুর আর রীনাকে। একটা একটা প্রকান্ড বৃক্ষ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আর তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

যে গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলো বনহুর আর রীনা, এবার গর্জিলা সেই গাছটার পাশে এসে দাঁড়ালো।

রীনা দু'হাতে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে ওর বুকে মুখ লুকালো।

সেই সময় গর্জিলা একটানে গাছটা তুলে নিলো হাতের মুঠায়।

যেমনি সে গাছটা তুলে নিয়েছে, অমনি সে বনহুর আর রীনাকে দেখে ফেলে। গর্জিলা আস্তে তুলে নেয় রীনাকে হাতের মুঠায়।

আর্ত চিৎকার করে রীনা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

বনহুর তাড়াতাড়ি একটা বড় পাথরখন্ডের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে সক্ষম হলো, তাই তখনকার মত রক্ষা পেলো গর্জিলার হাত থেকে।

গর্জিলা রীনাকে হাতের মুঠায় নিয়ে বিরাট বিরাট পা ফেলে চলে গেলো পর্বতমালার ওপারে।

বনহুর পাথরখন্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে সব দেখতে পেলো।

রীনাকে যখন গর্জিলা হাতের মুঠায় তুলে নিলো তখন রীনার হাত থেকে টাকা ও সোনাদানার থলেটা পড়ে গেলো ঝোঁপ–ঝাড়ের মধ্যে।

গর্জিলা রীনাকে নিয়ে চলে গেলো কিন্তু বনহুর তাকে বাধা দিতে পারলো না, কারণ সে যত শক্তিশালীই হোক একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ারের সঙ্গে পেরে উঠা তার পক্ষে কঠিন। বনহুর আড়াল থেকে নীরব দর্শকের মত চেয়ে চেয়ে দেখলো।

রীনার হাত থেকে পড়ে যাওয়া থলেটা বনহুর যে পাথরখন্ডের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলো, তার পাশে একটা গর্তের মধ্যে রেখে দিলো যাতে সেটা হারিয়ে না যায় বা কারো দৃষ্টিগোচর না হয়।

তারপর যে পথে গর্জিলাটা রীনা সহ উধাও হয়েছিলো বনহুর সেই পথে এগুতে লাগলো। পর্বতের গা বেয়ে উঠতে লাগলো বনহুর। গাছপালা ভেঙে চুরে একাকার হয়ে আছে যে পথে গর্জিলা গিয়েছে, তাই পথ চিনে নিতে কষ্ট হচ্ছে না বনহুরের।

কিন্তু সহজ নয় এ পথ অতিক্রম করা।

অতি কষ্টে বনহুর পর্বতের অনেক উপরে উঠে এলো। উপরে উঠে ওপাশে নিচে তাকাতেই দেখলো গভীর জঙ্গলে ঢাকা উঁচু–নিচু টিলা, আসলে ওগুলো পর্বতমালার অংশই বটে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো বিরাট বিরাট গাছপালাগুলো ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। গর্জিলার পায়ের ছাপ নজরে পড়লো তার।

বিলম্ব না করে বনহুর নামতে শুরু করলো।

ঐ মুহূর্তে তার কানে ভেসে এলো গর্জিলার গলার বিকট আওয়াজ।

বনহুর দৃষ্টি ফেলতেই বিস্মিত হলো, গর্জিলাটা একটা মস্তবড় পাথরের উপর বসে আছে, রীনাকে তার হাতের মুঠায় উঁচু করে ধরে দেখছে। রীনার দেহটা ঠিক গর্জিলার হাতের মুঠায় পুতুলের মত লাগছে।

মনে হলো রীনার সংজ্ঞা ফিরে আসেনি। আরও বুঝতে পারলো বনহুর, রীনাকে গর্জিলা হত্যা করেনি বা তার নিঃশ্বাসে ঝলসে দেয়নি। বনহুর কতকটা আশ্বস্ত হলো যেন। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো কি ভাবে রীনাকে উদ্ধার করা যায়।

যখন রীনাকে সে হাতের মুঠা থেকে কোথাও নামিয়ে রাখবে তখন তাকে উদ্ধার করা সহজ হবে, তা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কখন কোথায় সে রীনাকে নামিয়ে রাখবে কে জানে। বনহুর সেই প্রতীক্ষা করতে লাগলো। যতটুকু সম্ভব দ্রুত সে গর্জিলার কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য পর্বতের গা বেয়ে ওপাশে নামতে লাগলো।

পর্বতের মাঝে মাঝে ক্ষীণ জলাশয়, কোথাও বা ঝর্ণার আকারে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কোথাও বা ভীষণ বেগে, কোথাও শুষ্ক পাথর নুড়ি পড়ে আছে।

বনহুর সব ডিংগিয়ে এগুতে লাগলো।

কখনও উঁচু হয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও লতা বা শিকড় ধরে ঝুলে।

গর্জিলা ততক্ষণে রীনাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আবার সে বিরাট বিরাট পা ফেলে পর্বতের উপরিভাগে এগিয়ে চললো।

বনহুর কিছুতেই গর্জিলার পাশে বা কাছাকাছি পৌঁছতে পারলো না, ক্রমেই সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লো। তবু সে গর্জিলার পিছু ত্যাগ করলো না, মরিয়া হয়ে গর্জিলাকে অনুসরণ করলো সে।

গর্জিলা এক সময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

বনহুরের পক্ষে সম্ভব হলো না গর্জিলাকে অনুসরণ করে রীনাকে উদ্ধার করা। বনহুর ফিরে এলো ফাংহায় এবং পুলিশপ্রধানকে রীনা ও গর্জিলা সম্বন্ধে সব কথা জানালো।

পুলিশ প্রধান জানালেন সেনাবাহিনী প্রধানকে, কামানের দ্বারা গর্জিলাকে নিহত করতে হবে, তারপর উদ্ধার করতে হবে রীনাকে, এ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

বৈঠক বসলো, আলোচনা চললে এ ব্যাপার নিয়ে। পুলিশ মহলের সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় ছিলো বনহুরের, কারণ খোন্দকার বাড়ির রহস্য উদঘাটনের সময় পুলিশ মহলের সঙ্গে তাকে গভীরভাবে যোগাযোগ রাখতে হয়েছিলো।

বনহুর পুলিশ মহল এবং সোনাবাহিনীকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সহায়তা করবে বলে জানালো। পুলিশমহল ও সেনাবাহিনী প্রধান খুশি হলেন।

রাইফেলধারী পুলিশবাহিনী এবং কামানবাহিনী গাড়ি নিয়ে সেনাবাহিনীসহ বনহুর নিজে চললো সেই পর্বত অভিমুখে।

যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে তারা।

সেনাবাহিনী প্রধান ও বনহুর প্রথম গাড়িতে রয়েছে, তাদের হাতে রয়েছে বাইনোকুলার। পিছনে। একটা গাড়িতে রয়েছে ক্যামেরা আর ক্যামেরাম্যানরা।

অন্যান্য পুলিশ ভ্যানও আগেপিছে করে চলেছে।

গর্জিলার আবির্ভাবের কথাটা ফাংহা শহরে ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত গতিতে। সবার মনেই আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো। সবার মনেই ভীষণ আতঙ্ক, এ ভয়ঙ্কর জীবটা শহরে না এসে পড়ে। তাছাড়াও একটা মহিলাকে নিয়ে সে অন্তর্হিত হয়েছে।

ফাংহা পর্বতমালার পাদমূলে লক্ষ্য করে গাড়িগুলো দ্রুত এগুতে লাগলো।

রীনাকে গর্জিলা হত্যা করেছে না জীবিত রেখেছে তাও কেউ জানে না। আর জানবেই বা কেমন করে, গর্জিলা সে পর্বতের কোন্ আড়ালে বা কোন্ গুহায় আত্মগোপন করেছে কে জানে।

পর্বতের নিকটে পৌঁছে গাড়িগুলো একটা টিলার আড়ালে রেখে বনহুর ও পুলিশ প্রধান ও সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বাইনোকুলার হাতে নিয়ে টিলার উপরে উঠে এলো।

বনহুর ও দুই অধিনায়ক বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলো। অস্ত্রধারী পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের অস্ত্র নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ওখানে দাঁড়িয়ে কোনো ফল হলো না, গর্জিলার টিকিটাও পর্যন্ত দেখা গেলো না। আবার বনহুর দলবল নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

কিন্তু গাড়ি আর বেশিদূর এগুতে সক্ষম হলো না, উঁচুনিচু পাথরখন্ডে বাধা পড়লো।

সেনাবাহিনী প্রধানের নির্দেশে কিছু শুকনো কাঠ এবং তার সঙ্গে নেওয়া হয়েছিলো। আর নেওয়া হয়েছিলো কিছু খাবার কম পক্ষে দু'তিন দিনের উপযোগী।

সন্ধ্যায় ঘনিয়ে আসায় একটা সমতল জায়গা বেছে নিয়ে তাবু গাড়া হলো। পাশাপাশি তিনখানা তবু পড়লো।

একটা তাঁবুতে বনহুর এবং পুলিশ প্রধান ও সেনাপ্রধান রইলো। অপর দুই তাঁবুতে ক্যামেরাম্যান, পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনী পালাক্রমে রাত জাগার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

বনহুর তেমন ঘাবড়ালো না, কারণ তার জীবনে এমন অবস্থা অনেক এসেছে। কিউঁকিলার সঙ্গে সাগরতলে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিলো। সাগরতলে যে এমন ভয়ঙ্কর জীব আছে বা ছিলো তা পূর্বে অনেকেই জানতো না। কিউঁকিলাকেও বনহুর হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলো তার বুদ্ধিবলে।

আজ গর্জিলার সম্মুখীন হয়েছে বনহুর। গর্জিলাও তবু ঘাবড়ে যায়নি, সে গভীরভাবে চিন্তা করছে কিভাবে এই ভয়ঙ্কর জীবটাকে হত্যা করে রীনাকে উদ্ধার করবে।

সমস্ত রাতটা তারা জেগে কাটালো। বসে বসে আলোচনা করলো সবাই মিলে। কখন গর্জিলা বেরিয়ে আসবে তার ঠিক নেই। কাজেই অস্ত্রশস্ত সবকিছু প্রস্তুত করে নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

সমস্ত রাত কেটে গেলো গর্জিলার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। হঠাৎ ভোর রাতে ভীষণ শব্দ কানে এলো সবার।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলো।

একদল তাবু খোলা শুরু করে দিলো। গাড়িগুলো হটাবার জন্য নির্দেশ দিলেন পুলিশপ্রধান। গাড়িগুলো ছিলো বেশ কিছু দূরে একটা বড় টিলার আড়ালে।

গাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটলো ক'জন পুলিশ এবং মিলিটারী ড্রাইভার। কামানের গাড়িটা আরও সরিয়ে আনা যায় কিনা, এ জন্য সেনাবাহিনী প্রধান নির্দেশ দিলেন চালককে।

সে এক মহা হুলস্থুল ব্যাপার।

গর্জিলার গর্জনটা শোনা যাচ্ছে ঠিক পর্বতটার দক্ষিণ দিকে।

বনহুর, সেনা–অধিনায়ক ও পুলিশপ্রধান এরা তাড়াতাড়ি বাইনোকুলার হাতে একটা উঁচু টিলার উপরে এবং পর্বতের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। তারা চারদিকে দেখতে লাগলেন সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে এলো তাদের কানে। সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। পুলিশ বাহিনী এবং সেনাবাহিনী সবাই পর্বতের আড়ালে ও টিলার আড়ালে আত্নগোপন করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বনহুর ওয়্যারলেসে সমস্ত বাহিনীকে জানিয়ে দিলো সবাই যেন সতর্কভাবে নিজেদেরকে আড়ালে রেখে গর্জিলাকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়।

পুলিশ ও সৈনিকরা সেইভাবে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে গর্জিলার মাথাটা পর্বতের উপরে দেখা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিলো সবাইকে তোমরা সাবধান হও, গর্জিলাটা নজরে এসেছে।

সবাই চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখতে লাগলো, কে কোন দিকে ছুটলো তার ঠিক নেই। সবাই গর্জিলটাকে দেখছে এবং কিভাবে অস্ত্র চালনা করবে সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু ঐ সময় শোনা গেলো ওয়্যারলেসে বনহুরের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর, আপনারা কেউ গুলীগোলা ছুঁড়বেন না, গর্জিলার হাতের মুঠায় মিস রীনাকে দেখা যাচ্ছে।

সেনাবাহিনী প্রধান জানালেন, মিঃ আলম যা বলছেন সত্য। গর্জিলার হাতের মধ্যে কেউ আছে। বলেই মনে হচ্ছে। কাজেই গোলা–গুলী না ছুঁড়ে সবাই অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বারবার নির্দেশ দিচ্ছেন সেনাবাহিনী প্রধান ও বনহুর।

সবার আগে রয়েছে বনহুর নিজে।

বনহুরই পরিচালনা করে চললো এই দলটাকে।

ওদিকে গর্জিলা পর্বতের ওপাশ থেকে এদিকে পার হয়ে আসছে। ক্রমেই সে পর্বতের উপরে উঠছে, তখন তাকে আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বারবার গর্জিলা রীনাকে চোখের সামনে তুলে ধরে দেখছে। এখনও রীনা সংজ্ঞাহীন আছে না তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে, বোঝা যাচ্ছে না।

বনহুর ও দু অধিনায়ক বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছে। রীনাকে এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। পা দু’খানা সহ অর্ধেকটা দেহ তার ঝুলছে। মাথা এবং দেহের অংশ গর্জিলার হাতের মুঠায় রয়েছে।

একবার গর্জিলা রীনার সংজ্ঞাহীন দেহটা পর্বতের একটা তাকের মত সমতল জায়গায় রাখলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে গর্জে উঠলো কয়েকটা রাইফেল।

রাইফেলের গুলী গর্জিলার দেহ পর্যন্ত পৌঁছলো কিনা বোঝা গেলো না। তবে গর্জিলা সঙ্গে সঙ্গে রীনার দেহটা তুলে নিলো হাতের মুঠায়। তারপর সে ফিরে তাকালো নিচের দিকে, যেদিক থেকে রাইফেলের গুলী তীরের মত ছুটে এসেছিলো।

গর্জিলা এবার রীনার দেহসহ হাতখানা পিছন দিকে রেখে হা করে এক ধরনের হাওয়া বের করলো। সঙ্গে সঙ্গে আগুন বেরিয়ে এলো গর্জিলার মুখগহ্বর থেকে। সেকি ভীষণ চেহারা, পুলিশ বাহিনী আর সৈনিকরা কে কোন্ দিকে ছুটলো তার ঠিক নেই।

গর্জিলা ততক্ষণে এসে পড়েছে একেবারে কাছাকাছি! একটা পুলিশ হোঁচট খেয়ে উবু হয়ে পড়ে গেলো, সে উঠতে পারলো না আর। গর্জিলার পায়ের চাপে থেতলে পিষে গেলো তার দেহটা, শুধু শোনা গেলো একটা আর্তচিৎকার।

ওদিকে ক্যামেরাম্যানরা গর্জিলার ছবি নিচ্ছে দ্রুতহস্তে। বিস্ময়ে সবাই হতবাক হয়ে গেছে, এমন জীব তারা কোনোদিন দেখেনি।

গর্জিলার পায়ের চাপে যে পুলিশটার দেহ থেতলে গেলে তা কারও কারও নজরে পড়লো। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে সকলের মুখমন্ডল, তবু অধিনায়কদের নির্দেশ অমান্য করে পালাবার সাহস কেউ পাচ্ছে না।

ওয়্যারলেসে পুলিশবাহিনী প্রধান নির্দেশ দিলেন–গর্জিলার দেহ লক্ষ্য করে কামান থেকে গোলা ছোড়।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে জানালো তাহলে মিস রীনাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। রীনার মৃত্যু ঘটবে তাতে কোনো ভুল নেই। কাজেই আপনারা অপেক্ষা করুন, গর্জিলা মিস রীনাকে হাত থেকে নামিয়ে রাখলে আপনারা গর্জিলাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়বেন, তার পূর্বে নয়।

ওদিকে গর্জিলা ভীষণ শব্দ করে দ্রুত এগুচ্ছে।

গাছপালা ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

গর্জিলা মানুষগুলোকে দেখে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সে বারবার গর্জন করছে এবং বাম হাতে পাথরখন্ড তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে এদিক ওদিক। ডান হাতের মুঠায় রীনার দেহটা রয়েছে। মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে রীনার দেহটা।

বনহুর ও অধিনায়কদ্বয় বিপুল উদ্বিগ্নতা নিয়ে বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে দেখছে। মুখের কাছে ওয়্যারলেস যন্ত্র, প্রয়োজন মত তারা নির্দেশ দিচ্ছে পুলিশবাহিনী এবং সেনাবাহিনীকে।

পর্বতের যে অংশে গাড়িগুলো রাখা হয়েছিলো, সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে গর্জিলা। কামান চালকরা কামানের মুখ এদিকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ গর্জিলার দৃষ্টিপথে পড়ে যায় গাড়িগুলো।

গর্জিলা মনে করলো ওগুলো কোনো জন্তু জানোয়ার হবে, তাই সে দ্রুত এগিয়ে গেলো বড় বড় পা ফেলে। গর্জে উঠলো ভয়ঙ্কর শব্দ করে।

বনহুর বললো–মিঃ লিকোন, গর্জিলা এবার মিস রীনাকে রেখে গাড়িগুলো আক্রমণ করবে বলে মনে হচ্ছে।.......আপনারা লক্ষ্য করুন গর্জিলা গাড়িগুলোকে জীব বা জানোয়ার মনে করছে।

মিঃ লিকোন হবেন সেনাবাহিনী প্রধান, তিনি বনহুরের কথায় জবাব দিলেন–হা মিঃ আলম, আপনি যা বলছেন সত্য......গর্জিলা আমাদের গাড়িগুলোকে দেখতে পেয়েছে এবং গাড়িগুলোকে সে কোনো জন্তু মনে করে ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

চিৎকার করে উঠলেন পুলিশ অধিনায়ক মিঃ লি–সর্বনাশ, গর্জিলা আমাদের একখানা পুলিশ ভ্যান হাতের মুঠায় তুলে নিয়েছে। এইতো দেখছে সে গাড়িখানাকে চোখের সামনে তুলে ধরে।

বললেন মিঃ লিকোন–হাঁ, সে ভ্যানখানাকে উল্টোপাল্টে দেখছে। বুঝতে চেষ্টা করছে ওটার জীবন আছে কিনা.......ঐ দেখুন, ভ্যানখানাকে গর্জিলা ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে।

মিঃ লিথ বলে উঠলেন–ভ্যানখানাতে আগুন ধরে গেছে....

বনহুর বললো–গর্জিলা এবার আশ্চর্য হয়ে দেখছে ভ্যান থেকে আগুন এবং ধোঁয়া বেরুচ্ছে.......

বললেন অপর এক অফিসার–স্যার, গর্জিলা ভ্যানখানা তুলে নেবার পূর্বে ষ্টার্ট দেওয়া ছিলো, তাই ভ্যানখানাতে সহজে আগুন ধরে গেলো.......

ওদিকে ক্যামেরাম্যানরা দ্রুত মুভি ক্যামেরা চালিয়ে চলেছে। স্থিরচিত্র গ্রহণ করছে।

গর্জিলা পুনরায় অপর একটা গাড়ি তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললো।

হঠাৎ গর্জিলার দৃষ্টি পড়লো তাদের উপর। যেখানে বনহুর আর অধিনায়কগণ ছিলো আর ছিলো কয়েকজন ক্যামেরাম্যান।

গর্জিলা পা ফেলে এগুতে লাগলো।

বনহুর বললো–মিঃ লিথ, মিঃ লিকোন সাবধান, শিগগির আত্নগোপন করে ফেলুন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই গর্জিলা আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। একটুপর আমাদের অবস্থা ঐ ভ্যান দুটির মতই

ক্যামেরাম্যানরা আড়ালে লুকিয়ে পড়লো এবং অবিরত ছবি তুলে চললো।

বনহুর বললো–আমি নিজে কামানবাহী গাড়ি ব্যবহার করতে চাই এবং সুযোগমত কামান চালাতে চাই…

মিঃ লিকোন বললেন–বলেন কি মিঃ আলম, আপনি কি কামান বাহী গাড়ি চালাতে সক্ষম হবেন। এবং কামান চালাতে পারবেন?

বললো বনহুর–চেষ্টা করতে দোষ কি! আমরা এখন যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি তাতে চুপ করে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। মিঃ লিকোন, গর্জিলা শুধু মিস রীনাকেই হত্যা করে ক্ষান্ত হবে না, সে ফাংহা শহরে প্রবেশ করবে এবং শহরটাকে তছনছ করে ফেলবে।

মিঃ লিকোন বললেন–এ মুহূর্তে কি করা কর্তব্য বলুন মিঃ আলম।

আমি নিজে কামানবাহী গাড়ি চালাবো এবং গর্জিলাটাকে হত্যা করার চেষ্টা করবো, যদিও আমি কামান চালনায় দক্ষ নই।

মিঃ লিকোন বললেন–আপনার পাশে একজন দক্ষ সৈনিক থাকবে, সে সাহায্য করবে আপনাকে কামান চালানো ব্যাপারে…

বনহুর আর মিঃ লিকোন খুব অল্প সময়ে কথাবার্তা শেষ করলো।

ততক্ষণে গর্জিলা একেবারে তাদের টিলার কাছাকাছি এসে গেছে।

বনহুর নিজে সবাইকে একটা গোপন জায়গা দেখিয়ে দিলো এবং সে আড়ালে আত্মগোপন করে কামানবাহী গাড়ির দিকে এগুলো।

গর্জিলা তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছে, ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে সে। রীনাকে একবার সে চোখের সামনে তুলে ধরে দেখে নিলো, তারপর রেখে দিলে তাকে একটা গর্তের মধ্যে।

এবার গর্জিলা পাথরখন্ডটা তুলে নিলো, তারপর সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। ধরে ফেললো একজন সৈনিককে, তাকে মুখগহ্বরে তুলে দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। গর্জিলার চোয়ালের ফাঁকে সৈনিকটা পা দু'খানা কয়েক মুহূর্তের জন্য ছটফট করে উঠলো।

বনহুর দৌড়ে গেলো এবং কামানবাহি গাড়িটার মধ্যে উঠে দ্রুতহস্তে কামানের মুখ ফিরিয়ে নিলো গর্জিলাটার দিকে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে চললো বনহুর।

ঐ সময় গর্জিলা রীনাকে একটা গর্তের মধ্যে শুইয়ে রেখেছিলো। রীনা সংজ্ঞা ফিরে পেলেও সে মৃতের ন্যায় সম্বিৎহারা হয়ে পড়েছিলো, কারণ সে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছিলো। গর্জিলার হাতের চাপে দেহটা তার থেতলে যাবার উপক্রম হয়েছে। যদিও গর্জিলা তাকে হাল্কাভাবেই ধরে রাখে। গর্জিলা রীনাকে পুতুলমেয়ে মনে করেছে, তাই সে ওকে যত্ন করে রাখতে চায়। কিন্তু রীনা কি গর্জিলার হাতের মুঠায় নিজকে সুস্থস্বাভাবিক রাখতে পারে! রীনাকে নামিয়ে রাখতেই রীনা হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করে কিন্তু বেশিদূর সে এগুতে পারে না, ক্ষুধা–পিপাসায় রীনার দেহটা অবশ হয়ে এসেছে। একটু নড়াচড়া করার শক্তি তার যেন আর নেই।

ক্যামেরাম্যানরাও তাদের ক্যামেরা নিয়ে ছুটলো আড়ালে। কিন্তু গর্জিলার কবল থেকে তবু রক্ষা পেলো না একজন ক্যামেরাম্যানসে তার ক্যামেরাসহ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো, অমনি গর্জিলা উবু হয়ে তাকে তুলে নিলো হাতের মুঠায়। কয়েক মিনিট সে ওকে চোখের সম্মুখে ধরে দেখলো, তারপর মুখে পুরে দিয়ে চিবিয়ে ফেললো।

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়লো গর্জিলার চিবুক বেয়ে।

ক্যামেরাম্যানটাকে যখন মুখে পুরলো ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুরের কামান গর্জে উঠলো। গর্জিলার ঠিক উরুতে লাগলো কামানের গোলা।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চিৎকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো গর্জিলা।

বনহুর ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিলো সবাইকে, গর্জিলার উরুর হাড় ভেঙে গেছে এবং সে ভীষণভাবে আহত হয়েছে। মিঃ লিকোন, আপনি মিস রীনাকে উদ্ধার করুন। বিলম্ব করা ঠিক হবে না, হয়তো গর্জিলা উঠে দাঁড়াবে এবং মিস রীনাকে হাতের মুঠায় তুলে নেবে।

মিঃ লিকোন রীনার কাছাকাছি ছিলেন, তাই বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা লক্ষ্য করে তাকেই নির্দেশ দিলো রীনাকে উদ্ধার করে নিতে।

মিঃ লিকোন দলবল নিয়ে এগুলেন বটে কিন্তু রীনার কাছে পৌঁছবার পূর্বেই গর্জিলা উঠে দাঁড়ালো এবং ভীষণভাবে মুখগহ্বর থেকে অগ্নি নির্গত করতে লাগলো।

দুতিন জন পুলিশ এবং সৈনিক ঝলসে গেলো গর্জিলার মুখ গহ্বরের তপ্ত নিঃশ্বাসে। গর্জিলা পুনরায় হাতের মুঠায় তুলে নিলো রীনাকে।

রীনা এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো যে, সে একটা টু শব্দ পর্যন্ত করতে পারছিলো না। নেতিয়ে পড়েছিলো রীনা একেবারে। অবশ্য রীনা দেখতে পাচ্ছিলো তাকে উদ্ধারের জন্য কতকগুলো লোক সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে। কামানের শব্দও তার কানে পৌঁছে ছিলো, রীনা উপলব্ধি করেছিলো কিন্তু তার কিছু করবার ক্ষমতা ছিলো না।

গর্জিলা রীনাকে হাতের মুঠায় তুলে নিতেই রীনা ক্ষীণ আর্তনাদ করে উঠলো। পা দু'খানা হাতের মুঠায় ছটফট করে নাড়তে লাগলো।

বনহুর বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেখতে লাগলো সবকিছু। গর্জিলার হাঁটু বেয়ে রক্তের স্রোত নেমে আসছে। খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে হাঁটছে গর্জিলা আর মাঝে মাঝে রীনাকে তুলে ধরে দেখছে। বনহুর মনে মনে ভাবছে এ যে ঠিক সেই কিংকং–এর কাহিনীর মত ঘটনা। কিংকং আর পুতুল–মেয়ে……কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই। বনহুর পুনরায় গর্জিলাকে লক্ষ্য করে কামান থেকে গোলা ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এগুতে লাগলো।

উঁচুনীচু পথ, কাজেই কামানবাহী গাড়ি চালিয়ে তাকে অগ্রসর হতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিলো। অবশ্য চালক নিজেও ছিলো কামানবাহী গাড়িখানাকে এবং

বনহুরকে সাহায্য করছিলো।

বনহুর এবং দলবল যতই গর্জিলাকে নিহত করার জন্য চেষ্টা চালাক না কেন, সফলকাম হলো না তারা। গর্জিলা পর্বতমালার আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে গেলো।

রীনাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলো না।

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলো বনহুর এবং দলবল। কয়েকজন সঙ্গীকে তারা হারিয়েছে, হারিয়েছে দুটা গাড়ি এবং একটা মুভি ক্যামেরা।

শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো নানাজনের মুখে মুখে। সংবাদপত্রে ছবি বেরুলো গর্জিলার নানাভাবে। কখনও গর্জিলার পূর্ণদেহ, কখনও বা শুধু মুখ আবার কোনো সময় অর্ধেক অংগ। গাড়িখানাকে যখন গর্জিলা দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছিলো তখনকার ছবিও ক্যামেরাম্যান ধরে রেখেছিলো, তাও ছাপা হলো।

ফাংহাবাসীর মনে ত্রাসের সঞ্চার হলো, তারা ভীত হয়ে পড়লো, না জানি কখন অতর্কিতে শহরে এসে পড়বে জীবটা। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না কেউ। সবাই গর্জিলাকে নিয়ে নানাভাবে আলাপ আলোচনা করতে লাগলো।

ঘরে বাইরে পথেঘাটে সব জায়গায় ঐ একই কথা, এমন জীবন তারা কোনোদিন দেখেনি। সিনেমা শো বন্ধ হয়ে গেলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য। দোকানপাট সব সন্ধ্যার পূর্বেই বন্ধ হতে শুরু করলো। সবার মনেই ভীষণ ভয় আর আতঙ্ক! না জানি কখন গর্জিলা এসে পড়বে এবং শহরবাসীদের হত্যা

ফাংহা সরকার ঘোষণা করলেন এই জীবটাকে যদি কোনো দল বা কোনো বাহিনী নিহত করতে সক্ষম হয় তাহলে তাদেরকে এক কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

পুলিশবাহিনী সেনাবাহিনী প্রধান এবং অন্যান্য অফিসার মিলে বৈঠকে বসলেন। আলাপ–আলোচনা চললো, কিভাবে গর্জিলাকে হত্যা করা যায়। তাই নিয়েই গভীরভাবে পরামর্শ চললো।

পরদিনই পুনরায় ফাংহা পর্বত অভিমুখে রওয়ানা দেওয়ার কথা পাকা হলো, কারণ বিলম্ব হলে রীনাকে আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে না।

কামান, মেসিনগান, রাইফেল এবং অন্যান্য ভারী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রওনা দিলো বনহুর ও সেনাবাহিনী অধিনায়ক এবং পুলিশ বাহিনীসহ পুলিশ অধিনায়ক।

আজ লোকসংখ্যা পূর্বদিনের চেয়ে অনেক ব্যস্ত।

পূর্বদিন চারজনকে হারিয়েছে তারা, তিনজন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোক আর একজন ক্যামেরাম্যান। চারজনকে হারিয়ে সবার মনে একটা দারুণ, ক্রোধ জেগেছে, যেমন করে হোক আজ তারা গর্জিলাকে হত্যা না করে ছাড়বে না, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে সবাই।

পর্বতের নিকটবর্তী এসে তারা চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। আজ যেন গর্জিলার কবলে কাউকে পড়তে না হয় বা প্রাণ হারাতে না হয়।

সেদিন আর গর্জিলার সাক্ষাৎ পওেয়া গেলো না। কাজেই তাবু গেড়ে সবাই আশ্রয় নিলো পর্বতের কাছাকাছি একটা নিচু জলাভূমির মধ্যে। সেখান থেকে পর্বতের উপরি পর্বতের উপরিভাগ চট করে নজরে পড়বে কিন্তু সেখানে কেউ এসে পৌঁছতে বিলম্ব হবে।

তাঁবুর মধ্যে সবাই সজাগভাবে জেগে রইলো। তবে কেউ কেউ ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো, তারা অবশ্য পালা করে ঘুমোবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর পরই সেইশব্দ কানে এসে পৌঁছো গর্জিলার গলার আওয়াজ। গর্জিলা আহত হয়ে যন্ত্রণায় এমন শব্দ করতে লাগল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাঁবুর মাঝখানে অগ্নিকুন্ড জ্বেলে বসেছিলেন অধিনায়ক আর স্বয়ং বনহুর।

অপর এক অগ্নিকুন্ডের চারপাশ ঘিরে বসেছিলেন অন্যান্য পুলিশ অফিসার এবং কয়েকজন সৈনিক। তারা সবাই অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে।

বনহুর বললো–অন্ধকারে গর্জিলার গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে আমি এগুতে চাই, দেখতে চাই সে কোথায় কিভাবে অবস্থান করছে।

বনহুরের কথা শুনে গভীর উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বলে উঠেন মিঃ লিকোন সর্বনাশ, এই রাতের অন্ধকারে আপনি তাবুর বাইরে যাবেন!

মিঃ লিথ বললেন–তা হয় না মিঃ আলম, আপনাকে আমরা কিছুতেই বাইরে যেতে দিতে পারি না, কারণ এই পর্বত অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে শুধু গর্জিলাই নয়, আরও ভয়ঙ্কর জীব আছে।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো আপনারা যা বলছেন সত্য কিন্তু আমাকে যেতেই হবে মিঃ লিকোন, কারণ মিস রীনাকে উদ্ধার করা আমার একান্ত কর্তব্য।

মিঃ লিকোন বললেন–এই রাতের অন্ধকারে আপনি তাকে দেখতে পাবেন তো? তাছাড়া কোথায় আছে গর্জিলা কে জানে।

আমার হাতে শক্তিশালী টর্চ আছে, আমি নিজকে গোপন রেখে টর্চের আলো ব্যবহার করে গর্জিলাকে খুঁজে বের করতে পারবো এবং মিস রীনাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

বনহুর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং কোমরের বেল্টে রিভলভার এবং পিঠে রাইফেল বেঁধে নিলো। রিভলভারখানা ছিলো বনহুরের প্রিয় অস্ত্র। এটা শব্দবিহীন এবং এর গতিবেগ ছিলো অনেক বেশি।

বনহুর যখন রাইফেল, বন্দুক বা মেসিনগান ব্যবহার করতো তখন এ রিভলভার তার কোমরের বেল্টে থাকতো। প্রয়োজনমত সে তার নানা অস্ত্র একই সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে পারতো। পিঠে রাইফেল বা মেসিনগান রাখার বেল্ট থাকতো, কাজেই তার কোনো অসুবিধা হতো না। তাই সে ইচ্ছামত প্রয়োজনবোধে নানা অস্ত্র নানাভাবে ব্যবহার করতে পারতো। একই সময় হয়তো মেসিনগান চালিয়ে শত্রু ধ্বংস করলো, এবার ঐ দন্ডে দ্রুতহস্তে মেশিনগান পিঠের খাপে রেখে রিভলভার চালাতে কিংবা ছোরা নিয়ে বসিয়ে দিতো শত্রুর বুকে।

বনহুর গর্জিলা হত্যা উদ্দেশ্যে ফাংহা পর্বত অভিমুখে রওনা দেবার সময় রাইফেল, মেসিনগান এবং তার প্রিয় রিভলভারখানা সঙ্গে এনেছিলো।

বনহুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্ধকাররেই বেরিয়ে পড়লো। মিঃ লিকোন, মিঃ লিথ এবং অন্যান্য অফিসার বিস্মিত হলেন। সবাই হতবাক হয়ে গেছেন একেবারে। একা এই নির্জন ভয়ঙ্কর পর্বতের বুকে যাওয়া কম কথা নয়!

বনহুর যখন তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেলো তখন মিঃ লিকোন বললেন, আশ্চর্য দুঃসাহসী ব্যক্তি, যার মধ্যে ভয় বলে কিছু নেই।

মিঃ লিথ বললেন–মিঃ আলম এক অদ্ভুত মানুষ, যাকে কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না। ওকে আমরা যত দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি, কারণ এমন ব্যক্তি কমই নজরে পড়ে।

বললেন মিঃ লিকোন–সত্যি বলেছেন মিঃ লিথ, এমন ব্যক্তি কমই নজরে পড়ে, যেমন সুদর্শন তেমনি মহৎ ব্যবহার……

শুধু তাই নয়, তেমনি শক্তিশালী……

হাঁ, ঠিক বলেছেন, অত্যন্ত শক্তিশালী হলেন মিঃ আলম।

যাকে নিয়ে আলোচনা চলছিলো সে তখন তার থেকে বেরিয়ে পর্বতমালার গা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। যদিও অন্ধকার রাত, তবু সব স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো। বনহুর কৌশলে এগুচ্ছিলো, তার বাম হাতে টর্চ এবং ডানহাতে রিভলভার ছিলো।

বনহুর শব্দ লক্ষ্য করে এগুচ্ছে।

গর্জিলার গলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে তা ঠিক বোঝ যাচ্ছে না। বনহুর মাঝে মাঝে সতর্কভাবে শোনার চেষ্টা করছে।

আরও উপরে উঠে এলো সে।

রাতের অন্ধকারে চারদিক ঝাপসা লাগছে। বনহুর অতি সতর্কতার সঙ্গে পর্বতের গা বেয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিচ্ছে পথ।

বেশ কিছুদূর উঠে এলো সহজে।

মাথার উপরে তারাভরা আকাশ। হুর হুর করে হিমেল হাওয়া বইছে। বনহুর তাকিয়ে দেখলো নিচে কুয়াশাঘন পর্বতমালার কোলে তাদের তাবুগুলো একএকটা ঘুমন্ত ক্ষুদে পাহাড় বলে মনে হচ্ছে। দূরে সমুদ্র, সমুদ্রের গর্জন কানে ভেসে আসে ক্ষীণ জলকল্লোলের মত!

এখন গর্জিলার কলের আওয়াজ থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কামানের গোলার আঘাতে গর্জিলা অত্যন্ত কাবু হয়ে পড়েছে।

আবার চলতে লাগলো বনহুর।

বেশ কিছু সময় নীরবে চলার পর হঠাৎ তার কানে এলো মানুষের গোঙ্গানির আওয়াজ। তাও পুরুষকণ্ঠ নয়, নারীকন্ঠের শব্দ। বনহুর বুঝতে পারলো নিকটেই কোনো গুহার বা পাথরখন্ডের আড়ালে রীনা আছে এবং সেই এভাবে গোঙ্গাচ্ছে।

বনহুর কান পেতে শুনলো কোন্‌দিক থেকে শব্দটা আসছে। তারপর সেই দিক লক্ষ্য করে যতদূর সম্ভব দ্রুত চলতে লাগলো।

বেশিক্ষণ তাকে চলতে হলো না, হঠাৎ গোঙ্গানির শব্দটা অতি নিকটে মনে হলো।

গর্জিলার কণ্ঠের ভয়ঙ্কর আওয়াজটা কিছুক্ষণ হলো আর শোনা যাচ্ছে। হয়তো ঝিমিয়ে পড়েছে কিংবা সরে গেছে আরও দূরে। বনহুর টর্চের আলো ফেলে নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো।

এ জায়গাটা পর্বতমালার সবেচেয়ে উঁচু স্থান। আশেপাশে কতকগুলো ছোটবড় গুহা রয়েছে। তারই কোনো এক গুহা থেকে নারীকণ্ঠের গোঙ্গানির শব্দ বের হয়ে আসছে।

বনহুর দেখলে যে গুহা থেকে শব্দটা আসছে সেটা সম্পূর্ণ খাড়া একটা শৃঙ্গ। বনহুর সেই গুহায় ততক্ষণে ভের দিকে তাকিয়ে দেবরিয়ে ছিলো, এখন পৌঁছবে তার কোনো উপায় নেই। টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগলো সে, আর চিন্তা করতে লাগলো কি ভাবে উঠবে সেখানে।

শৃঙ্গটা এত খাড়া যে কোনো ভাবে সেখানে উঠে যাবার মত খোঁজ বা পাথরখন্ড নেই।

বনহুর শৃঙ্গের অপর পারে যাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো এবং কৃতকার্য হলো সে। ওপাশে পৌঁছতেই আশায় আনন্দে মন তার দুলে উঠলো। শৃঙ্গটা একপাশে একেবারে খাড়া কিন্তু অপর পাশে বেশ ঢালু।

এবার বনহুর স্বচ্ছন্দে উপরে উঠতে লাগলো।

ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে।

বনহুর হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাঁবু থেকে এই এতদূর পৌঁছতে পুরো এগারো ঘন্টা তার সময় লেগেছে। রাত আটটায় বনহুর বেরিয়ে ছিলো, এখন ভোর সাতটা, ঠান্ডায় হাত পা জমে আসছে যেন।

বনহুর টর্চটা পকেটে রেখে রিভলভার উদ্যত করে সম্মুখস্থ গুহায় উঁকি দিলো, কিন্তু কিছু নজরে পড়লো না। আবার এগুতে লাগলো উপরের দিকে। কোনো জায়গা অত্যন্ত পিছল, কোনো জায়গা উঁচু নীচু অসমতল।

একটা গুহার পাশে এসে দাঁড়াতেই বনহুর স্পষ্ট শুনতে পেলো গোঙ্গানীর ক্ষীণ আওয়াজ। এ কণ্ঠস্বর যে রীনার তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর টর্চটা বের করে নিলো, তারপর সতর্কতার সঙ্গে প্রবেশ করলো সেই গুহায়। একটু এগুতেই সে দেখতে পেলো রীনা পড়ে আছে সেই গুহার মেঝেতে।

ভোরের আলোতে স্পষ্ট নজরে পড়লো রীনার করুণ অবস্থা। পর্বতমালার এত উপরে এমন এক শৃঙ্গে এ ধরনের গুহা থাকতে পারে, এটা যেন কতকটা বিস্ময়কর। রীনা চোখ বন্ধ অবস্থায় পড়ে গোঙ্গাচ্ছিলো, কাজেই সে বনহুরকে দেখতে পায় না বা কারও উপস্থিতি বুঝতে পারে না।

কতদিন সম্পূর্ণ অনাহারী সে।

ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়েছে তার দেহটা। দেহের বসন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

বনহুর টর্চের আলো জ্বেলে ভাল করে দেখলো রীনাকে, তারপর ডাকলো–মিস রীনা! মিস রীনা.......।

রীনার কানে প্রথমে বনহুরের কণ্ঠস্বর পৌঁছলো না, সে যেমন আজন মনে ক্ষীণ স্বর গোঙ্গাচ্ছিলো তেমনি গোঙ্গাতে লাগলো।

বনহুর রীনার পাশে বসে মাথাটা উঁচু করে পুনরায় ডাকলো–মিস রীনা, আমি এসেছি...মিস রীনা, দেখুন আমি এসেছি........

ধীরে ধীরে চোখ মেললো রীনা, প্রথমে যেন চিনতেই পারলো না সে, তারপর দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে বললো–মিঃ আলম......চোখ দুটো যেন তার খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, তারপর ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো–ঐ ভয়ঙ্কর জীবটা......

বনহুর বললো–মিস রীনা, আপনি ধৈর্য ধরুন। আর কোনো ভয় নেই......

রীনাকে বনহুর তুলে নিলো হাতের উপর, তারপর বেরিয়ে এলো গুহার বাইরে।

সূর্যের আলো তখন পর্বতমালার উপরিভাগে এসে পড়েছে। সূর্যের আলোতে রীনা মিঃ আলমকে ভালভাবে দেখলো, হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো রীনা।

বনহুর ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো–মিস রীনা, এখন আপনি মিছামিছি ভাবছেন এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবে।

মিঃ আলম, আমি যে এক পাও চলতে পারছি না। ঐ জীবের হাতের তালুর চাপে আমার দেহটা একেবারে থেতলে গেছে, তাছাড়া আজ কদিন এক ফোঁটা পানিও আমার মুক্তে পড়েনি...

বনহুর রীনার কথাবার্তায় বুঝতে পারলো না, তার কথা বলার শক্তি নেই, গলা থেকে ক্ষীণ আওয়াজ বের হচ্ছিলো, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও নেই তার।

কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে বিলম্ব করা যায়না। গর্জিলা হয়তো এক্ষুণি পিরে আসবে। বনহুর রীনাকে নিয়ে পর্বতের গা বেয়ে নামতে লাগলো যতদূর দ্রুত নামা যায়।

ওদিকে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ লিকোন ও মিঃ লিপ্ত দলবলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে বললেন, তার মনে করেন মিঃ আলম রাতের অন্ধকারে তাবু থেকে বাইরে গেছে, তিনি আর জীবিত নেই। নিশ্চয়ই কোনো জীবজন্তুর কবলে প্রাণ হারিয়েছেন। জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই ফিরে আসতেন।

বাইনোকুলারে চোখে রেখে দেখছেন মিঃ লিকোন, উঁচু এক টিলার উপরে দাঁড়িয়ে, তার পাশে আছেন মিঃ লিথ এবং আরও কয়েকজন অফিসার, সবার চোখেমুখে মিঃ আলমের জন্য উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

মিঃ লিকোন হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন—মিঃ লিথ আনন্দ ধ্বনি করুন, আনন্দধ্বনি করুন, মিঃ আলম জীবিত আছেন এবং তিনি ফিরে আসছেন।

মিঃ লিথ দ্রুতহস্তে চোখে বাইনোকুলার লাগলেন এবং তিনিও বলে উঠলেন– তাইতো, মিঃ আলম তাহলে মৃত্যুবরণ করেননি, তিনি জীবিত আছেন।

কয়েকজন মিলে ছুটলেন মিঃ আলম যেদিক থেকে আসছিলো সেই দিকে। মিঃ আলমের কাঁধে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে তাদের।

তখনও মিঃ আলম অনেক নিচে নেমে এসেছে। পর্বতমালার গা বেয়ে নামছে সে, তার কাঁধে মিস রীনা। রীনার জ্ঞান ফিরে এলেও তার দেহ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, তাই সে এক পা ও চলতে পারছিলো না।

বনহুর আর রীনাকে মিঃ লিকোর এবং তাদের দলবল যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। একসময় তাদের ফিরিয়ে আনা হলো তাবুতে।

রীনাকে সুস্থ করে তোলার জন্য সবাই নানাভাবে চেষ্টা চালাতে লাগলো। সঙ্গে ফল ছিলো, বনহুর নিজে ফলের রস তৈরি করে রীনার মুখে তুলে ধরলো।

রীনা ফলের রস খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলো।

মিঃ লিকোন বললেন–এখানে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না, গর্জিলা এসে পড়তে পারে।

সবাই রাজি হলো এখনই রওয়ানা দেওয়া উচিত, নইলে নতুন কোনো বিপদ ঘটতে পারে।

প্রথম দিন দু'খানা পুলিশ ভ্যান গর্জিলার কবলে বিনষ্ট হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে চার ব্যক্তি। আজ তাই মিঃ লিকোন অনেক বেশি লোজন এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছেন। গাড়িও এনেছেন প্রথম দিনের চেয়ে বেশি।

বনহুর আর রীনা মিঃ লিকোনোর গাড়িতে উঠে বসলো।

অবশ্য রীনাকে অতি যত্নসহকারে তুলে নেওয়া হলো, তার নিজের কোনো শক্তি ছিলো না যে গাড়িতে উঠে বসে। রীনা ঢলে পড়ছিলো বারবার বনহুরও তাকে

ধরে রাখলো। সবাই ক্যামেরা এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন ভ্যানে চেপে বসলো।

ইতিমধ্যে তাবুও গুটিয়ে ফেলা হয়েছিলো।

গাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে চলতে শুরু করলো। সবার মনে দুঃখ, গর্জিলাকে সারিবদ্ধভাবে চলতে শুরু করলো। সবার মনে দুঃখ, গর্জিলাকে তারা হত্যা করতে সক্ষম হলো না। তবু একটা সান্ত্বনা, মিস রীনাকে তারা উদ্ধার করতে পেরেছে।

কিন্তু বেশিদূর এগুতে না এগুতেই তাল গাছের গোড়ার ন্যায় একখানা পা পথ রোধ করে ফেললো। চমকে তাকালো সবাই, বিস্ময়ে ভয়ে আরষ্ট হয়ে গেলো, সবাই উপরের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পেলো গর্জিলা বিরাট হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এক পায়ে ভর করে হাটছে গর্জিলা।

অপর পা খানা তার দুলছে ঝুলন্ত থামের মত। প্রথম দিন বনহুরের কামানের গোলার আঘাতে গর্জিলার একখানা পা অকেজো হয়ে পড়েছিলো।

গাড়িগুলো সম্মুখে গর্জিলার পা এসে পড়ায় পথ রোধ হলো বটে, কিন্তু একপাশে বেশ ফাঁকা জায়গা ছিলো। বনহুর ড্রাইভারদের উদ্দেশ্যে বললো– তোমরা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে যাও...এক মুহূর্ত বিলম্ব করোনা...গর্জিলা মিস রীনার সন্ধানে আমাদের গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছে...তার একখানা পা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে দ্রুত চলতে পারছে না...গাড়িগুলো ছত্রভঙ্গ করে বেরিয়ে যেতে হবে, নইলে রক্ষা নেই।

কথাটা শেষ হয় না বনহুরের গর্জিলা একটা চলন্ত পুলিশ ভ্যান তুলে নিলো হাতের মুঠায়। ভ্যানটা হাতে তুলে নিতেই কয়েকজন পুলিশ ভ্যান থেকে ছিটকে পড়লো নিচে বিক্ষিপ্তভাবে।

বনহুরের নির্দেশেই গাড়িগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলো। দু'একটা গাড়ি গর্জিলার পায়ের পাশ কেটে পেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো, আর অন্যান্যগুলো ছড়িয়ে পড়লো এদিক ওদিক।

গর্জিলা মাথাটা নিচু করে সবগুলো গাড়ির অভ্যন্তরে লক্ষ্য করছিলো। রীনাকে যে খুঁজছে তাতে কোনো ভুল নেই। বনহুর রীনাকে পিছন আসনের নিচে গাড়ির

মেঝেতে লম্বালম্বি শুইয়ে দিলো, দ্রুত হস্তে তারপর নিজে ঐ গাড়ির চালককে পাশের আসনে বসতে বলে নিজে বসলো ড্রাইভ আসনে এবং হ্যান্ডেল চেপে ধরলো।

ঐ গাড়িতে ছিলেন মিঃ লিকোন, মিঃ লিথ ও আরও দু'জন অফিসার।

বনহুর বললো–আমি কৌশলে গাড়িখানাকে গর্জিলার আয়ত্তের বাইরে পার করে দেবো, তারপর আমি কামানবাহী গাড়িতে আরোহণ করবো এবং গর্জিলাকে নিহত করবো...আপনারা যার যার গাড়ি নিজ নিজ দায়িত্বে গর্জিলা থেকে দূরে সরে যান...

বনহুরের মুখের কাছে শব্দ যন্ত্র থাকায় তার কথাগুলো সকলেই শুনতে পাচ্ছিলো। দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে গাড়ি চালাতে লাগলো বনহুর এবং প্রয়োজনমত সকলকে নির্দেশ দিতে লাগলো সে।

গর্জিলাটা তার হাতের গাড়িখানা দুরে নিক্ষেপ করলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, আর একটা ভ্যান সে তুলে নিলো অতি স্বচ্ছন্দে। সেই গাড়ির আরোহীদের অবস্থাও তাই হলো, কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়লো তার ঠিক নেই। কারণ মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হলো, কারো দেহটা থেতলে গেলো পাথরের আঘাতে। কারও হাত-পা ভেঙে গুড়ো হলো–সেকি ভীষণ অবস্থা হলো সকলের!

বনহুর তার গাড়িখানা ব্যাক করে পিছনে নিলো, তারপর উল্কাবেগে সম্মুখে এগুলো...মাত্র কয়েক মুহূর্ত, বনহুর গাড়িখানাকে গর্জিলার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে সক্ষম হলো। ঠিক গর্জিলার পায়ের পাশ কেটেই বনহুর গাড়িখানাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

গর্জিলা বুঝতেই পারলো না ঐ গাড়িখানার মধ্যে তার পুতুল মেয়েটা আছে বা ছিলো।

মিঃ লিকোন বলে উঠলো–সাবাস মিঃ আলম, আপনি গর্জিলার সীমানার বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়েছেন। এবার আমরা সবাই নিশ্চিন্ত কিন্তু যারা এখনও গর্জিলার সম্মুখ ভাগে রয়েছে, তারা ভীষণ বিপদগ্রস্ত রয়েছে...

বনহুর আরও কিছু এগুবার পর বললো–হাঁ মিঃ লিকোন, এখন আমরা নিশ্চিন্ত বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

ইতিমধ্যে পুলিশবাহিনী এবং সৈনিকরা গর্জিলাটাকে লক্ষ্য করে মেসিনগান এবং রাইফেল চালাতে শুরু করে দিয়েছে। আঁঝরা হয়ে যাচ্ছে ওর দেহটা তাতে কোনো ভুল নেই। তবু গর্জিলা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে ভর করে। সে পুলিশ ভ্যান ও অন্যান্য অস্ত্র বাহী গাড়িকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে কিন্তু সে দ্রুত এগুতে পারছে না। বাম পাখানা তার একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভালভাবে হাঁটতে পারছে না সে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে গর্জিলা।

হাত দিয়ে মেসিনগানের গুলীগুলোকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না, গুলীগুলো বিদ্ধ হচ্ছে তার হাতের তালুতে।

বনহুর মিঃ লিকোনকে লক্ষ্য করে বললো–মিঃ লিকোন, আপনারা মিস রীনাসহ শহরে ফিরে যান, কারণ মিস রীনা ভয়ানক অসুস্থ এবং দুর্বল। গর্জিলাটার দেহ গোলাগুলীর আঘাতে জর্জরিত হয়েছে, ওকে হত্যা করা এখন মোটেও কঠিন হবে না। প্রথম দিন কামানের গোলার আঘাতে ওর উরুর হাড় ভেঙে গেছে। কাজেই সে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

বললেন মিঃ লিকোন–গর্জিলাটা এত কাহিল হওয়া সত্ত্বেও আজ আবার সে আমাদের দু'খানা গাড়ি নষ্ট করে ফেললো এবং কতকগুলো লোককে হতাহত করলো।

বললো বনহুর–আর যেন সে কোনো ক্ষতি সাধন করতে না পারে এজন্য আমরা তাকে শেষ করবো। পুলিশ এবং সৈনিক ভাইদের নিয়ে আমি....

তা হয় না মিঃ আলম, আপনাকে একা ফেলে রেখে আমরা যেতে পারি না। বললেন মিঃ লিকোন।

মিঃ লিথ বললেন–মিঃ লিকোন, আপনি মিস রীনাকে নিয়ে শহর অভিমুখে যান। আমরা সবাই মিলে মিঃ আলমকে সাহায্য করবে।

মিঃ লিথের কথায় বনহুর বললো, আপনি যা বলেছেন তা নিতান্ত সত্য। মিস রীনার মঙ্গলের জন্য মিঃ লিকোনকে শহরে ফিরে যাওয়া দরকার।

বেশ, তাই হোক, আমি মিস রীনাসহ শহর অভিমুখে রওয়ানা দিচ্ছি! বললেন মিঃ লিকোন।

বনহুর গাড়ির গতি কমিয়ে নিয়ে বললো–মোটই বিলম্ব করা সম্ভব নয়। মিঃ লিকোন, আপনি চলে যান, মিস রীনার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন।

ড্রাইভার এসে বসলো ড্রাইভ আসনে।

বনহুর আর মিঃ লিথ নেমে এলো গাড়ি থেকে।

মিস রীনার অবস্থা শোচনীয়, তাই সে কোনো কথা বলতে পারলো না, নইলে মিঃ আলমকে সে এ মুহূর্তে ছেড়ে যেতে পারতো না।

বনহুর আর মিঃ লিথ নেমে দাঁড়াতেই একখানা গাড়ি এসে পড়লো। গাড়িখানা ছিলো সেনাবাহিনীর, তারা দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলো, তাই এগিয়ে এসেছিলো বনহুর ও মিঃ লিথকে তুলে নিতে।

বনহুর আর মিঃ লিথ সেনাবাহিনীর ভ্যানে উঠে বসতেই ভ্যান দ্রুত পর্বতমালা পাদমূল লক্ষ্য করে এগুলো। অবশ্য বনহুর স্বয়ং নির্দেশ দিলো। কোন্ পথে এগিয়ে তারা কামানবাহী গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে।

কামানবাহী গাড়িখানা তখন পর্বতমালার একপাশে একটা টিলার আড়ালে অপেক্ষা করছিলো। ইতিমধ্যে কামান থেকে দুটো গোলা গর্জিলার দেহ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে কিন্তু তাতে গর্জিলা কিছুমাত্র কাহিল হয়নি, কারণ কামানের গোলা গর্জিলার দেহ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারেনি। তাছাড়া কামানবাহী গাড়িখানা ছিলো পর্বতমালার অপর পাশে বড় একটা টিলার আড়ালে।

বনহুর কামানবাহী গাড়িখানা নিয়ে দ্রুত এগুতে লাগলো যে দিকে গর্জিলাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছিলো সেইদিকে। ভয়ঙ্কর শব্দ বের হচ্ছে এবার গর্জিলার কণ্ঠ দিয়ে, মাঝে মাঝে সে এক পায়ে ভর করে কিছু কিছু এগুচ্ছে। গর্জিলার হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগুচ্ছিলো।

বনহুর এবার গর্জিলার নিকটে যাবার জন্য কামানবাহী গাড়িখানায় মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ক্ষীপ্রভাবে গাড়িখানাকে গর্জিলার ঠিক কাছাকাছি নিয়ে কামান থেকে গেলো নিক্ষেপ করলো।

গোলাটা এসে গর্জিলার বুকে লাগলো।

ভীষণ একটা আর্তনাদ করে উঠলো গর্জিলা, তার বুক ভেদে করে গোলাটা বেরিয়ে গেছে। দর দর করে রক্ত গড়িয়ে পড়লো বুক বেয়ে।

টলছে গর্জিলার দেহটা।

করাত দ্বারা গাছের মূল কাটার পর বৃক্ষের অবস্থা যেমন দাঁড়ায় ঠিক তেমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে গর্জিলাটার। গর্জিলা এক পায়ে দাঁড়িয়ে দুলছে। মাত্র কয়েক মিনিট, গড়িয়ে পড়লো পর্বতমালার পাদমূলে।

একটা পাহাড় যেন শুয়ে পড়লো আলগোছে।

বনহুর বললো–গর্জিলা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এবার আমরা নিশ্চিন্ত।

ফটোগ্রাফার রিপোর্টার সবাই ছুটলো গর্জিলার কাছাকাছি গিয়ে ছবি নেবার জন্য। কারও কোনোদিকে খেয়াল নেই, সবাই গর্জিলার নিকটবর্তী হবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

বনহুর নিজেও এসে পৌঁছলো গর্জিলার কাছাকাছি। তার চোখেমুখেও বিস্ময়, এমন জীব সেও দেখেনি ইতিপূর্বে।

গর্জিলার মৃত্যু সংবাদ শহরে গিয়ে পৌঁছলো।

দলে দলে শহরবাসী আসতে শুরু করলো। সবাই সঙ্গে এনেছে ক্যামেরা, ছবি নিচ্ছে চারদিক থেকে।

ফাংহা পর্বতমালার পাদমূলে যেন মেলা বসে গেলো। নানা বর্ণের হাজার হাজার গাড়ি এসে থামতে লাগলো, বিভিন্ন ধরনের নারী–পুরুষ এসে জমা হলো গর্জিলার পাশে।

বনহুর তখন শহর অভিমুখে রওনা দিয়েছে।

মিঃ আলমকে দেখার জন্য সবাই ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে, কে এমন বীর পুরুষ যে, গর্জিলার মত একটা বিরাট এবং ভয়ংকর জীবকে হত্যা করতে সক্ষম হলো!

বিপুল আয়োজন।

বিভিন্ন দেশ থেকে সরকারি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এলেন মিঃ আলমকে অভিনন্দন জানাতে। ঐ সভায় তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

*

ফাংহা শহরে ইতিপূর্বে এতবড় সভার আয়োজন কোনোদিন হয়নি। সরকারের তরফ থেকে মিঃ ফিকোন মিঃ আলমকে পুস্কার প্রদান করবেন।

মিস রীনা আর মিঃ আলমবেশী দস্যু বনহুর মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে, অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও রয়েছে সেখানে। মঞ্চের চারপাশ ঘিরে বসেছেন সম্মানিত নাগরিকরা।

বিদেশ থেকে এসেছেন কয়েকজন অধিনায়ক যারা গর্জিলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানার আগ্রহ নিয়ে ফাংহায় আগমন করেছেন। মঞ্চের সম্মুখ ভাগে বসেছেন তারা। সবাই যেন মঞ্চের উপর স্পষ্ট দেখতে পায় সেইভাবে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।

মিস রীনাকে দেখার আগ্রহও কম নেই সকলের, কারণ কোন মহিলাকে গর্জিলা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো এবং তারই জন্য গর্জিলা প্রাণ হারালো জানবার কৌতূহল সবার।

বনহুর আর মিস রীনা মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে।

এখন মিস রীনা সম্পূর্ণ সুস্থ।

গর্জিলা নিহত হবার পর দুদিন কেটে গেছে। এই দুদিন ফাংহা হসপিটালে ছিলো রীনা, সেখানে তার সুচিকিৎসা হয়েছে, সেবাষ হয়েছে ভালভাবে, কাজেই রীনার শরীর এখন ভাল।

আজ রীনা গোলাপী শাড়ি পরেছে। গোলাপী ব্লাউজ এবং জুতোও তার গোলাপী রঙের, এমনকি ফিতাটাও গোলাপী রঙের ছিলো। সত্যিই রীনাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো আজ।

বনহুরের শরীরে আজ কালো পোশাক। তবে তার দ্য ড্রেস নয়, মূল্যবান স্যুট।

বনহুর আর রীনার দু'পাশে দুই সেনাপ্রধান এসে দাঁড়ালেন।

সবার দৃষ্টি মঞ্চের দিকে।

কে এই মহাপুরুষ যার হাতে নিহত হলে গর্জিলার মত একটা ভয়ঙ্কর জীব।

সেনাবাহিনী প্রধান মিঃ আলমের পরিচয় দিয়ে গর্জিলার হত্যা কাহিনী বর্ণনা করে শোনালেন এবং মিস রীনা সম্বন্ধে সব কথা সংক্ষেপে জানালেন।

বিদেশ থেকে আগত মহান অতিথিদের সঙ্গে একজন এসেছেন তিনি হলেন মিঃ হুসাইন। মিঃ জাফরীর মধ্যে তিনি অনেকদিন বনহুর গ্রেপ্তার ব্যাপার নিয়ে কান্দাই ছিলেন। মিঃ হুসাইন স্বয়ং বনহুরকে স্বচক্ষে দেখেননি তবে তার ছবি মিঃ জাফরীর কাছে দেখেছেন।

মিঃ হুসাইন মুহূর্তে চিনে ফেললেন বনহুরকে, তিনি ভীড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, সকলের অলক্ষ্যে তিনি বেরিয়ে এলেন। বনহুকে গ্রেপ্তার করতে পারলে দু'লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে।

শুধু দু'লক্ষ টাকা নয়, দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে পারলে পাবেন বিরাট সুনাম, পাবেন খেতাব। এমন সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন।

মিঃ হুসাইনকে বনহুর চেনে না কিন্তু যখন তিনি দর্শকমহলের সারি থেকে উঠে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন তখন বনহুরের দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না। বনহুরের মনে সন্দেহের ছায়াপাত হলো, সম্মুখ সারিতে বসেছেন বিদেশী অধিনায়করা– তাদের মধ্যে আছেন বিদেশী পুলিশ অধিনায়ক, গোয়েন্দা প্রধান, রাষ্ট্রদূত এবং আরও গণ্যমান্য ব্যক্তি। যিনি আসন ত্যাগ করে উঠে গেলেন তিনি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নন তা সুনিশ্চিত কিন্তু কে তিনি? তার আসন ত্যাগের মধ্যে কোনো অভিসন্ধি রয়েছে বেশ বুঝতে পারে বনহুর এবং মিঃ লিকোন যখন বনহুর আর

রীনা সম্বন্ধে বলছিলেন, তখনই ঐ ব্যক্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

সবার অলক্ষ্যে সরে পড়তে চাইলেও তিনি তা পারলেন না, বনহুর লক্ষ্য করলো এবং সেও আলগোছে মঞ্চ থেকে নেমে এলো।

তখন রীনা আর গর্জিলা সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝিয়ে বলছিলেন মিঃ লিকোন। কেউ তেমনভাবে লক্ষ্য করতে পারলেন না, বনহুর সবার দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ওদিকে মিঃ হুসাইন এসে পুলিশ প্রধানের অফিসরুমে প্রবেশ করলেন এবং ফাংহা পুলিশ প্রধানকে ডাকলেন, কোনো জরুরি কথা আছে বল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ প্রধান অফিসে এলেন, তার সঙ্গে এলেন গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিঃ মেনিলো–একমুখ দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখ, চোখে একজোড়া কালো চশমা, পরিচ্ছন্ন পোশাক।

মিঃ মেনিলেও বিদেশ থেকে এসেছিলেন গর্জিলাটাকে দেখবার বাসনা নিয়ে। তিনিও পুলিশ প্রধানের সঙ্গে এলেন পুলিশ প্রধানের অফিসে।

মিঃ হুসাইন পুলিশ প্রধানকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন, তারপর মিঃ মেনিলোর দিকে তাকাতেই পুলিশ প্রধান মেনিলোর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিঃ মেনিলো হাত বাড়িয়ে মিঃ হুসাইনের হ্যান্ডসেক করলেন।

তারপর আসন গ্রহণ করলেন সবাই।

বললেন মিঃ হুসাইন বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে আলাপ আছে আপনার সঙ্গে, তাই চলে এলাম।

বললেন পুলিশ প্রধান–বলুন?

মিঃ মেনিলোও প্রশ্নভরা চোখ দুটো তুলে ধরলেন মিঃ হুসাইনের মুখের দিকে।

মিঃ হুসাইন বললেন–যিনি গর্জিলাটাকে নিহত করে সুনাম এবং কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তিনি কি আসলেই গোয়েন্দা বিভাগের লোক এবং তার নাম মিঃ

আলম।

বললেন পুলিশ প্রধান–হাঁ, মিঃ আলম আমাদের সুপরিচিত, তিনি একজন দক্ষ ডিকেটটিভ। ফাংহার খোন্দকার বাড়ির গভীর রহস্য মিঃ আলম উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিপূর্বে পুলিশ মহল এবং ফাংহা গোয়েন্দা বিভাগ বহু চেষ্টা চালিয়েও খোন্দকার বাড়ির গভীর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হননি কিন্তু তিনি হয়েছেন। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন পুলিশ প্রধান।

মিঃ হুসাইনের ভ্রুকুঞ্চিত হলো, তিনি বললেন–আপনি যাই বলুন, মিঃ আলম বলে যাকে আপনারা সম্ভাষণ বা অভিনন্দন জানাচ্ছেন তিনি আসলে গোয়েন্দা বিভাগের লোক নন।

পুলিশ প্রধান বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–বলেন মিঃ স্যার!

হাঁ সত্যি, মিঃ আলম এমন একজন বিশেষ ব্যক্তি যার নাম শুনলে আপনি হতবাক হবেন।

বলেন কি!

হা।

তাহলে কি তিনি?

তিনি বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর.......

দস্যু বনহুর! একসঙ্গে পুলিশ প্রধান এবং মিঃ মেনিলা বলে উঠলেন, তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠলো রাজ্যের বিস্ময়।

অনেকক্ষণ ওরা দুজন কোনো কথা বলতে পারলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে, বললেন পুলিশ প্রধান–দস্যু বনহুর মিঃ আলম, এটা আপনি কি করে জানলেন বা বুঝতে পারলেন

আমি দুবছর পূর্বে দস্যু বনহুরের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কান্দাই শহরে গিয়েছিলাম, তখন আমি মিঃ। জাফরীর সঙ্গে কাজ করেছি এবং এই দেখুন আজও দস্যু বনহুরের ছবি আমার পকেটে আছে।

মিঃ হুসাইন পকেট থেকে একটা ফটো বের করে টেবিলে রাখলেন।

মিঃ মেনিলো ফটোখানা তুলে নিলেন হাতে, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন। বনহুর…মিঃ আলম, হাঁ, একই ব্যক্তি বটে!

…..কথাটা বলে ফটোখানা তিনি পুলিশ প্রধানের হাতে দিলেন।

পুলিশ প্রধান ফটোখানা অবাক চোখে দেখতে লাগলেন..কি বিস্ময়, মিঃ আলম আর দস্যু বনহুর একই ব্যক্তি, তাতে কোনো সন্দেহ বা ভুল নেই। শুধু পোশাকের পার্থক্য মাত্র। ফটোখানা তীক্ষ্ণ নজরে দেখলেন পুলিশপ্রধান এবং সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন– মিঃ আলমের প্রতি নজর রাখতে হবে এবং কৌশলে গ্রেপ্তার করতে হবে।

মিঃ হুসাইন পুলিশপ্রধানকে লক্ষ্য করে বললেন–মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত হবে না, আপনি এক্ষুণি মিঃ আলমকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুত হন এবং আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করুন, আমি নিজে মিঃ আলমবেশী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে চাই।

বেশ আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি, এক্ষুণি আমার সহকারীকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি।

মিঃ মেনিলো বললো–হাঁ, ঠিক বলছেন, এই দন্ডেই মিঃ আলমকে গ্রেপ্তার করুন নইলে সে উধাও হতে পারে কারণ দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করি আমরা তত সহজ নয়।

বললেন মিঃ হুসাইন–আশা করি, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে আপনিও আমাকে সাহায্য করবেন মিঃ মেনিলো?

বৃদ্ধ মেনিলোর ঘোলাটে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি প্রস্তুত আছি মিঃ হুসাইন। কিন্তু বিলম্ব করা মোটেই উচিত হবে না। উঠে পড়ুন এই মুহূর্তে……

পুলিশপ্রধান সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে পুলিশবাহিনীকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন।

তারপর উঠে পড়লেন সবাই।

ওদিকে তখন সেনা–অধিনায়ক মিস রীনা আর গর্জিলার সম্বন্ধে জনগণকে বুঝিয়ে বলছিলেন, কেমনভাবে গর্জিলা আর খেলনার মত পুতুল মেয়েটার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন হারালো।

কথা শেষ হয়নি, সেনাবাহিনীর অধিনায়কের, ঠিক ঐ মুহূর্তে সভার চারদিক ঘিরে ফেললো সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। পুলিশপ্রধান নিজে রিভলভার হাতে মঞ্চে উঠে এলেন এবং তার পিছনে এলো কয়েকজন অস্ত্রধারী পুলিশ।

মিঃ লিকোন অবাক কণ্ঠে বললেন–ব্যাপার কি?

পুলিশপ্রধান বললেন–মিঃ আলম দস্যু বনহুর! সে কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

মিঃ লিকোন বলে উঠেন–মিঃ আলম দস্যু বনহুর......বলেন কি!

হাঁ, সে কোথায়? বললেন পুলিশপ্রধান।

এবার সবার চোখই মিঃ আলমকে সন্ধান করে ফিরলো কিন্তু মিঃ আলম কোথায়...তার কোনো চিহ্নই নেই আশেপাশে। বিস্ময় ফুটে উঠলো মিঃ লিকোনের মুখোভাবে, তিনি দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন মঞ্চের উপরে।

রীনার চোখে রাজ্যের বিস্ময়, মিঃ আলম দস্যু বনহুর....বলে কি এরা! রীনা দস্যু বনহুরের নাম শুনে এসেছে, কিন্তু সে যে কেমন তা জানে না। দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর চেহারার এক ব্যক্তি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিঃ আলম যে দস্যু বনহুর, এ কথা সবাই বিশ্বাস করলেও রীনা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় একেবারে!

পুলিশ ফোর্স তখন সভার মধ্যে মিঃ আলমকে সন্ধান করে চলেছে।

সভার লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কিন্তু পুলিশবাহিনী কাউকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না। পুলিশ প্রধান মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন আপনারা ভয় পাবেন না বা কোনোরকম উদ্বিগ্নতা নিয়ে ছুটোছুটি করবেন না, কারণ দস্যু বনহুর আপনাদের কোন ক্ষতি সাধন করবে না এবং আমাদের পুলিশবাহিনী বা সৈন্যবাহিনীও আপনাদের কাউকে কিছু বলবে না। আপনারা স্থির হয়ে বসুন। দস্যু বনহুর এই জনসভায়

আত্মগোপন করে আছে, আমরা তাকে খুঁজে বের করবো। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা, হইহুল্লোড় করে আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাবেন না।

কিন্তু কে শোনে পুলিশপ্রধানের অনুরোধ, দস্যু বনহুর নাম শোনামাত্র সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তারা কিছুতেই স্থির হচ্ছেন না। ভয়ে আতঙ্কে তাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। সবার মনেই পালাইপালাই ভাব।

তবু চেষ্টা চালাতে লাগলেন পুলিশপ্রধান। মিঃ আলমকে যিনি এই মুহূর্তে ধরিয়ে দিতে পারবেন তাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এখনই।

এত শর্তেও মিঃ আলমকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সবার দৃষ্টি মিঃ আলমের সন্ধানে ফিরতে লাগলো। যদি হঠাৎ পাওয়া যায় তাহলে এক্ষুণি তার ভাগ্যে আসবে বিশ হাজার টাকা।

পুলিশপ্রধান শব্দযন্ত্রের সম্মুখ থেকে সরে দাঁড়াতেই মিঃ মেনিলো শব্দযন্ত্রের মুখে এসে দাঁড়ালেন। তিনি তার কালো চশমার ফাঁকে একবার দেখে নিলেন জনগণকে, কারণ মিঃ আলমবেশী দস্যু বনহুর যদি আত্নগোপন করে থাকেন ঐসব সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে। ভালভাবে দেখে নিয়ে বললেন মিঃ আলম দস্যু বনহুর এ কথা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু সে অমানুষ নয় তাও আমি জানি, কাজেই তাকে দেখে ভয় বা আতঙ্কের কিছু নেই। আমরা শুধু দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবো, আপনাদের কারও কোনো ক্ষতি সাধন হবে না। দস্যু বনহুর শয়তানের শত্রু সে আপনাদের কারো কোনো অনিষ্ট করবে না। তাই আপনারা মিঃ আলমবেশী দস্যু বনহুরকে ধরিয়ে দিন। এটা শুধু আমার অনুরোধ নয়, ফাংহা সরকারের অনুরোধ........

তখনও রীনা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ মেনিলো বললেন–আপনি নিশ্চিন্তভাবে বাড়ি ফিরে যান। দস্যু বনহুর আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।

রীনা বললো–জানি না কেন আমার বুক কাঁপছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ আলম স্বয়ং দস্যু বনহুর। না, কিছুতেই আমি বিশ্বাস করি না এ কথা....

হাসলেন মিঃ মেনিলো–আপনি তার উপরের রূপটাই দেখেছেন ভিতরের রূপ জানেন না মিস রীনা, তাই একথা বলছেন।

কিন্তু কেউ নেই আমার আপনজন, আমি কার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবো, বলুন?

বেশ, আমি আপনাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

না, তা হয় না মিঃ মেনিলো, আমি এই মুহূর্তে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

পুলিশপ্রধান তখন পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন মিঃ মেনিলো আপনি যান মিস রীনাকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

রীনা বললো–হাঁ, তাহলে আমি আশ্বস্ত হবে, আপনি আমার পিতু সমতুল্য।

বৃদ্ধ মিঃ মেনিলো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন–বেশ, তাই চলুন মিস রীনা।

রীনা সহ মিঃ মেনিলো বেরিয়ে এলেন মঞ্চ থেকে।

রীনার গাড়িখানা বাইরে অপেক্ষা করছিলো, সেই গাড়িতে চেপে বসলেন মিস রীনা আর মিঃ মেনিলো।

অবশ্য মিঃ মেনিলোই ড্রাইভ আসনে বসেছেন, কারণ তিনিই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

মিঃ মেনিলো বললেন–আপনার বাসার ঠিকানাটা?

রীনা বললো–১১২ নং ফাংহা মিস্কলেন–খোন্দকার বাড়ির পাশেই আমার বাসা।

মিঃ মেনিলো গাড়িতে ষ্টার্ট দিলেন। গাড়িখানা বেগে চলতে শুরু করলো।

গাড়িখানা যখন চলছিলো তখন রীনাকে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছিলো। ভাবছিলো সে এখানে তার কেউ নেই আপনজন বলতে। মিঃ আলম ছিলেন তার একমাত্র ভরসা। কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষ নন, তিনি দস্যু–তিনি ডাকু। না না, এমন মহৎ ব্যক্তি কোনোদিন দস্যু বা ডাকু হতে পারে না……

পারে মিস রীনা সব পারে! মানুষের উপরের রূপটাই আসল রূপ নয়...

ড্রাইভ আসন থেকে বললেন মিঃ মেনিলো তিনি যেন বুঝতেই পারছিলেন রীনার মনের কথা, তাই যেন বললেন কথাগুলো।

রীনা অবাক হলো, সে ভেবে পাচ্ছে না তার মনের কথা কি করে জানতে পারলেন মিঃ মেনিলো, তবে কি তিনি হঠাৎ বলেছেন, হয়তো কথাটা মিলে গেছে তাই তার মনের কথার সঙ্গে। বললো রীনা– মিঃ আলম বাইরেও ছিলেন যেমন তেমনি তার ভিতরটাও। অত্যন্ত ভদ্র এবং মহৎ ব্যক্তি মিঃ আলম......

কিন্তু সে যে একজন দস্যু একথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

যখন আমি নিজে তার আচরণে কিংবা তার ব্যবহার জানতে পারবো বা বুঝতে পারবো অথবা তিনি মুখে স্বীকার করবেন তিনি দস্যু বনহুর, তখন আমি বিশ্বাস করবে, তার পূর্বে নয়।

আপনি কি চান বনহুর আবার ফিরে আসুক বা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুক?

হাঁ, আমি তাকে দেখতে চাই, তার আসল পরিচয় আমি তার মুখে জানতে চাই মিঃ মেনিলো।

কিন্তু সে কি আসবে? তাকে ফাংহা পুলিশবাহিনী খুঁজে ফিরছে......।

সত্যি আমি দুঃখিত–ব্যথিত মিঃ আলমের জন্য, কারণ তিনি না হলে আজ আমি বাঁচতাম না–আমি গর্জিলার কবলে প্রাণ হারাতাম, এটা সুনিশ্চিত। শুধু আমি নই, ফাংহাবাসীর অবস্থা শোচনীয় হতো, কারণ গর্জিলা একসময় শহর অভিমুখে চলে আসতো।

সে কথা অবশ্য ঠিক। মিঃ আলম গর্জিলাটাকে নিহত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

শুধু করেছিলেন নয় করেছেন। তিনি না হলে গর্জিলাটাকে নিহত করা কারও পক্ষে সম্ভব হতো না। কাজেই মিঃ আলম যদি সত্যিই দস্যু বনহুর হন তবু তার কাছে ফাংহাবাসী কৃতজ্ঞ......।

ড্রাইভ করতে করতেই মিঃ মেনিলো জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু আর জবাব দেওয়া হলো না, বাসার সম্মুখে গাড়িখানা থেমে পড়লো।

রীনা অবাক কণ্ঠে বললো–আপনি আমার বাসা চিনতেন নাকি?

হাঁ–না না, আমি চিনবো কি করে! কথাটা বলে মিঃ মেনিলো গাড়ি থেকে নেমে পিছন আসনের দরজা খুলে ধরে বললো–নেমে আসুন।

নেমে আসলো রীনা, তার দু'চোখে বিস্ময় কারণ মিঃ মেনিলো এদেশে নতুন, তিনি কি করে চিনলেন তার বাসা। রীনা তো শুধু রাস্তার নাম্বার বলেছিলো, বাসার নয়, তবু কি করে তিনি সঠিক বাসা চিনে নিলেন দক্ষ ড্রাইভারের মত।

রীনা ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। হঠাৎ মনে পড়লো মিঃ মেনিলোকে সে তো ধন্যবাদ জানালো না বা তাকে আমন্ত্রণ জানালো না ফিরে তাকাতেই অবাক হলো রীনা, পিছনে এগিয়ে মিঃ মেনিলো।

রীনা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো–আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি আসছেন সত্যি আমি খুশি হলাম। আসুন চা পান করে যাবেন।

এই ঠান্ডায় একটু চা পেলে মন্দ হয় না কিন্তু।

রীনা আর মিঃ মেনিলো উপরে উঠে গেলো।

ড্রইংরুমে বসলো তারা। রীনা কলিংবেল টিপতেই বয় এসে দাঁড়ালো।

রীনা বললো–চা নিয়ে আয়।

বয় চলে গেলো।

একটু পরের এলো গরম চা।

রীনা এতক্ষণ মিঃ আলমকে নিয়েই আলোচনা করছিলো, বয় চায়ের ট্রে আনতেই রীনা দাঁড়িয়ে চায়ের ট্রে সম্মুখ টেবিলে রাখলো তারপর এককাপ চা তুলে নিয়ে মিঃ মেনিলোর হাতে দিতে গেলো– এই নিন গরম চা।

মিঃ মেনিলো কাপটার দিকে হাত বাড়াতেই চমকে উঠলো তার হাতের আঙ্গুলের আংটিটার উপর নজর পড়তেই বিস্মিত হলো রীনা, বললো–সে–এ আংটি আপনি কোথায় পেলেন মিঃ মেনিলোর

এ আংটি আমার বন্ধু আমাকে উপহার দিয়েছে।

আপনার বন্ধু?

কে তিনি?

বললে আপনি তাকে চিনবেন কি?

বলুন কে তিনি?

তিনি কান্দাইবাসী, তার নাম মনিরুজ্জামান চৌধুরী, তিনি এ আংটি আমাকে উপহার দিয়েছেন।

কান্দাইবাসী, আপনার বন্ধু…তার নাম মনিরুজ্জামান চৌধুরী।

হাঁ, তিনিই আমাকে এ আংটি দিয়েছেন। কথাটা বলে মিঃ মেনিলো চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কাপে চুমুক দেন।

রীনা বললো–কিন্তু কতদিন পূর্বে এ আংটি আপনার বন্ধু আপনাকে উপহার দিয়েছেন?

এবার মিঃ মেনিলোর কালো চশমার আড়ালে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

অবশ্য রীনা তা দেখতে বা জানতে পারলো না।

মিঃ মেনিলো বললেন–উপহারটা তিনি আজই দিয়েছিলেন কয়েক ঘন্টা পূর্বে।

রীনার চোখ দুটোতে আরও বিস্ময় ফুটে উঠলো। বললো সে বলেন কি, মিঃ মেনিলো, আপনার বন্ধু আজই কয়েক ঘন্টা পূর্বে আপনাকে এ আংটি উপহার দিয়েছেন!

বললাম তো হা।

কিন্তু আপনি জানেন না, এ আংটি কার আংগুলে ছিলো এবং তা কি করে আপনার বন্ধু মনিরুজ্জামান চৌধুরী পেলো আর তা আপনাকে উপহার দিলেন?

আমি ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারছি না মিস রীনা।

আপনি জেনে রাখুন এ আংটি যার তিনিই মিঃ আলম, যাকে আপনি মনিরুজ্জামান চৌধুরী বলে জানাচ্ছেন……

বলেন কি!

হাঁ, ঐ আংটি মিঃ আলমের আংগুলে ছিলো।

আপনি একথা সত্যি করে বলতে পারছেন।

নিশ্চয়ই পারছি, মিঃ আলমের আংগুলে আমি ঠিক ঐ আংটি দেখেছিলাম।

মিঃ মেনিলো বললেন–তাহলে মিঃ আলমই মনিরুজ্জামান? আপন মনে কথাটা বললেন তিনি।

আর কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পর বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ মেনিলো।

রীনার মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে, এখানে তার আপনজন বলতে কেউ বা আছে। মিঃ আলম তাকে তার হোট বোনের কাছে পৌঁছে দেবেন বলেছিলেন, তাও হলো না। মিঃ আলম দস্যু বনহুর, না

এ কেমন করে হয়। রীনার মনে নানারকম চিন্তার উদয় হতে থাকে। কিন্তু ভাল লাগছে না তার, শুধু মনে পড়ছে তার কথা। মিঃ আলমকে নিজের অজান্তে কখন যেন সে ভালবেসে ফেলেছিলো। ওকে ছাড়া যেন রীনা আর কিছুই ভাবতে পারে না।

ঐ দিন রাতেও ঘুমাতে পারলো না।

সমস্ত শহরে তখন মহাআতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, রেডিও–টেলিভিশনে বারবার জানানো হচ্ছে, যে ব্যক্তি মিঃ আলমবেশী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে দিতে সক্ষম হবে তাকে মহা মূল্যবান হীরকখন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।

যে হীরকখণ্ড বনহুর গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হলো তা দান করেছেন ফাংহা প্রেসিডেন্ট টমার্সলড়। তিনি বলেছেন, আমি চাইনা আমার দেশে এমন একজন দস্যু আস্তানা গাড়তে পারে–যদিও সে গর্জিলার মত ভয়ঙ্কর একটা জীবকে হত্যা করে দেশবাসীকে একটা মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

কথাটা রেডিও এবং টেলিভিশনে বলা হয়েছে অনেকবার। এমন কি টেলিভিশনে হীরকটা দেখানো হয়েছে। অতি মূল্যবান হীরক এটা, তাও বলা হয়েছে কয়েকবার।

রীনার কিন্তু মনটা খারাপ হয়েছে, সে মোটেই খুশি হতে পারেনি এ ব্যাপারে। মিঃ আলমকে গ্রেপ্তার করার জন্য এত প্রচেষ্টা–লক্ষ লক্ষ টাকার হীরক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ফাংহা প্রেসিডেন্ট।

ফাংহাবাসী সকলের মুখে মুখে ঐ এক কথা। সবার দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে মিঃ আলমকে।

রীনা নানা কথা ভাবছে, কত কি দৃশ্য ছায়াছবির মত ভাসছে, তার চোখের সামনে।

রাত বাড়ছে।

তবু রীনার চোখে ঘুম নেই।

এপাশ ওপাশ করছে রীনা, সত্যি কি মিঃ আলম আর কোনোদিন আসবে না। এমন মহৎ মহান এক ব্যক্তিকে দস্যু অপবাদ দিতে একটুও বাধলো না কারও।

রীনা অনেক কিছুই চিন্তা করছিলো শুয়ে শুয়ে।

ঠিক ঐ সময় একটা শব্দ হলো।

চমকে উঠলো রীনা, বললো সে– কে?

কোনো সাড়া এলো না।

একটা ছায়ামূর্তি জানালা দিয়ে প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

রীনা চিৎকার করতে যাবে অমনি ছায়ামূর্তি রীনার পাশে এসে তার মুখে হাতচাপা দিলো। ক্ষিপ্রগতিতে। যেন রীনা চিৎকার করতে না পারে, এ কারণেই দ্রুত এ কাজ করলো ছায়ামূর্তি।

রীনা কিছু বলবার পূর্বেই বললো ছায়ামূর্তিমিস রীনা আমি এসেছি……

মুহূর্তে রীনার কানে কে যেন সুধা ঢেলে দিলো।

ছায়ামূর্তি রীনার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো–ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন, তাই না?

আপনি!

হাঁ, মিস রীনা আমি দস্যু বনহুর।

না না, আমি বিশ্বাস করি না সে কথা।

কিন্তু যা সত্য তা কি গোপন রাখা যায়?

রীনা সুইচ টিপে আলো জ্বালালো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো সে বনহুরের মুখের দিকে, দেখতে লাগলো নিপুণভাবে, যেন কতকাল দেখেনি।

বনহুর হেসে বললো– কি দেখছেন অমন করে?

দেখছি আপনাকে।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

মিঃ আলম, ওরা যা বলেছেন তা কি আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।

বললাম তো, যা সত্য তা গোপন রাখা যায় না।

আপনি তাহলে বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর?

বিশ্ববিখ্যাত নই, বিশ্বকুখ্যাত দস্যু বনহুর।

মিঃ আলম...... রীনা বনহুরের জামা এঁটে ধরে তার বুকে মাথা রেখে বললো– আপনি দস্যু হন আর কুখ্যাতই হন, আমার কাছে আপনিই দেবতাসম! রীনা কথাটা বলে চট করে বনহুরের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম জানালো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজায় খট খট করে আওয়াজ হলো।

রীনা উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ মুছে বললো–কে?

কণ্ঠ ভেসে এলো–দরজা খুলুন।

বনহুর বললো–পুলিশমহলের কোনো ব্যক্তি এসেছেন।

আপনি...

আমি সরে যাচ্ছি, আপনি দরজা খুলে দিন।

কিন্তু...

না, কোনো কিন্তু নেই, আপনি সচ্ছন্দে দরজা খুলে দিন, আমি চলে যাচ্ছি।

আবার কবে আসবেন, বলুন?

যখন দরকার মনে করবো। যান দরজা খুলে দিন। যান বলছি..

রীনা দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে দরজার দিকে এগুলো। একবার সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিলো। মিঃ আলম যে জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন সেই জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

দরজা খুলে দিতেই কক্ষে প্রবেশ করলো মিঃ হুসাইন এবং কয়েকজন পুলিশ।

রীনা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–আপনারা এত রাতে?

মিস রীনা, মিঃ আলম এখানে এসেছে বলে জানতে পেরে আমরা এসেছি।

একেবারে অবাক হবার ভান করে বললো রীনা–মিঃ আলম এখানে এসেছেন ....আপনারা কি স্বপ্ন দেখছেন?

আমরা জানতে পেরেই এসেছি। বললেন মিঃ হুসাইন।

কই, আমি তো কাউকে দেখছি না। দেখুন আপনারা ঘরের ভিতরে দেখুন, খুঁজে দেখুন ভাল করে।

মিঃ হুসাইন এবং আর একজন পুলিশ অফিসার মিলে কক্ষ ভালভাবে সন্ধান করে দেখলেন কিন্তু মিঃ আলমকে খুঁজে পেলেন না।

ফিরে গেলেন মিঃ হুসাইন দলবল নিয়ে।

রীনা দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো। বিষণ্ন মনে বসে পড়লো সে বিছানায়। মনটা বড় অস্থির লাগছিলো তার, কারণ কত সাধনার পর মিঃ আলম এসেছিলেন কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে থাকতে দিলো না।

সমস্ত রাত রীনার অনিদ্রায় কাটলো, কারণ সে মনে করলো আবার যদি এসে ফিরে যায় তিনি।

*

ফাংহা প্রেসিডেন্ট–ভবনে একটা গোপন কক্ষ লৌহ–আলমারীতে সযত্নে রাখা হয়েছে সেই হীরকখন্ডটা যা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য।

কড়া পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে যেন কোনোক্রমে ঐ হীরকখন্ড খোলা না যায়।

কিন্তু পরদিন দেখা গেলো প্রেসিডেন্ট ভবনের সেই গোপন কক্ষের দরজা খোলা। কখন কোন পথে কে সেই গোপন কক্ষের লৌহআলমারী খুলে মূল্যবান হীরকখণ্ডটা নিয়ে উধাও হয়েছে।

কক্ষমধ্যে লৌহ-আলমারীর ভিতর যে কৌটা হীরকখন্ডটা ছিলো সেই স্বর্ণকৌটার মধ্যে পাওয়া গেলো। একটি চিঠি। চিঠিখানাকে কয়েক কলম লেখা ছিলো মাত্র, চিঠিখানা একজন অফিসার এনে প্রেসিডেন্টের সম্মুখস্থ টেবিলে রাখলেন।

প্রেসিডেন্ট স্বয়ং চিঠিখানা তুলে নিলেন হাতে এবং তা মেলে ধরলেন চোখের সম্মুখে। মাত্র ক'লাইন লিখা আছেঃ

ফাংহায় এসেছিলাম শুধু ফাংহাবাসীর মঙ্গল চিন্তা নিয়ে। দস্যুতা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। ফাংহা অধিনায়ক, আপনি আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য মহামূল্য হীরকখন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছেন কিন্তু জেনে রাখবেন ফাংহায় এমন কারও ক্ষমতা নেই যে আমাকে আটক করে। তাই আমি নিজে এই হীরকখন্ডটা নিয়ে গেলাম। দুঃস্থ জনগণের জন্য এটা কাজে আসবে।

–দস্যু বনহুর

চিঠিখানা ছিলো সম্পূর্ণ ইংরেজিতে লেখা, তাই ফাংহা অধিনায়কের পড়তে হলো না, তিনি একবার নয় বার কয়েক চিঠিখানা পড়লেন। তখনি ফাংহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আহ্বান জানালেন তিনি।

কালবিলম্ব হলো না শহরময় কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। রেডিওতে বারবার ঘোষিত হতে লাগলো, আপনারা যে কোনো ব্যক্তি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবেন তাকে ফাংহা সরকার একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন এবং তাকে সম্মানিত খেতাব দেওয়া হবে। আরও বলা হলো দস্যু বনহুর প্রেসিডেন্ট–ভবন থেকে মহামূল্যবান হীরকখন্ড নিয়ে উধাও হয়েছে এবং সে একখানা চিঠি রেখে গেছে চিঠিখানাতে সে প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছে তাকে কেউ আটক করতে সক্ষম হবে না। ফাংহাবাসীদের কাছে অনুরোধ, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে তার এই গর্ব ভেঙে দেওয়া উচিত।

রীনা নিজের বাসভবনে বসে শুনলো সব কথা। ঘৃণার বদলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো তার। মিঃ আলম সাধারণ মানুষ নন, তিনি সত্যিই এক বিস্ময়। কত সৌভাগ্য তার তাই সে এমন মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছিলো। দস্যু বনহুর সবার জন্য আতঙ্ক নয়, যারা দেশের সর্বনাশের মূল, যারা দেশের শত্রু তারাই ভয় পায় দস্যু বনহুরকে। বনহুর নিপীড়িত অসহায় মানুষের বন্ধু......

কথাগুলো ভাবছিলো রীনা।

সমস্ত দিন ভেবেছে শুধু মিঃ আলমকে একটিবার আবার সে দেখতে চায়, পেতে চায় কাছে। মিঃ আলম আজ তার কাছে এক অমূল্য সম্পদ, যাকে

গ্রেপ্তারের জন্য ফাংহা সরকার উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

রীনা যত ওর কথা ভাবছে তত সমোহিত হয়ে পড়েছে সে। গতদিনগুলোর স্মৃতি ভাবছে তার চোখের সামনে। গর্জিলার কবল থেকে যখন মিঃ আলম তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসেন তখন সে অনুভূতি জেগেছিলো রীনার মনে তা কোনোদিন সে ভুলবে না। কত স্নেহ, কত দরদ, কত মায়া ছিলো তার জন্য মিঃ আলমের মনে। অপূর্ব সে দয়া.......রীনার চোখে জল এসে যায়।

দরজায় খট খট আওয়াজ হলো।

চমকে উঠলো রীনা, ভাবলো এত রাতে কে এলো আবার তার বাসায়। আঁচলে চোখের পানি মুছে নিয়ে বললো–কে?

দরজা খুলুন, আমি মেনিলো।

এত রাতে মিঃ মেনিলো যাক বাঁচা গেলো, বাপের বয়সী এক মহান ব্যক্তি মেনিলো। কিছুক্ষণ কথাবার্তায় তবু কাটবে। রীনা উঠে দরজা খুলে দিলো। দেখলো মিঃ মেনিলো এবং আরও একজন তিনি হলেন মিঃ হুসাইন। রীনা অভিবাদন জানালো–আসুন।

ওরা ভিতরে এলেন।

বললেন মিঃ মেনিলো–আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম, কারণ আপনার কাছে আমাদের কিছু জানার আছে।

জিজ্ঞাসা করুন বললো রীনা।

মিঃ হুসাইন বললেন–মিস রীনা, আপনি বসতে বললে খুশি হতাম।

রীনা একটু হেসে বললো–ভুলে গেছি, বসুন আপনারা। আসুন...... সোফাগুলো দেখিয়ে দিলো সে।

মিঃ মেনিলো হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন–বেশিক্ষণ বিরক্ত করবো না আমরা আপনাকে। রাত এখন সাড়ে বারোটা, কাজেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাবো। রীনাকে লক্ষ্য করে বললেন মিঃ মেনিলো– বসুন।

বসলো রীনা।

মিঃ হুসাইন বললেন মিস রীনা, দস্যু বনহুর প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে মহামূল্যবান হীরকখন্ডটা নিয়ে উধাও হয়েছে, এ কথা আপনি শুনেছেন?

হাঁ, জানতে পেরেছি। গম্ভীর কণ্ঠে বললো রীনা।

বললেন মিঃ হুসাইন–মিঃ আলমকে আপনি যেভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হবেন সেভাবে আর কেউ তাকে সনাক্ত করতে সক্ষম হবে না। মিস রীনা, আশা করি আপনি যদি তাকে সনাক্ত করে ধরিয়ে দিতে পারেন তাহলে ফাংহা সরকার আপনার কাছে চিরঋণী থাকবেন এবং আপনাকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।

রীনা মৌনভাবে কিছু ভাবছিলো।

মিঃ মেনিলো বললেন–আপনিই আপনিই একমাত্র তাকে দেখে চিনতে পারবেন, কারণ সে অনেকদিন আপনার এখানে ছিলো। যদিও সে আমার পরিচিত জন। একথা আমি নিজে জানিয়েছি মিঃ হুসাইনকে।

হাঁ, উনি বলেছেন কিছুদিন পূর্বে নাকি মিঃ মেনিলোর সঙ্গে মিঃ মনিরুজ্জামান নামক ব্যক্তির পরিচয় ঘটে কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মায়নি বলে তিনি তাকে ভালভাবে সনাক্ত করতে পারেন না, তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

বেশ, আমি তাকে সনাক্ত করতে প্রস্তুত আছি। বললো রীনা।

খুশি হলেন মিঃ হুসাইন।

মিঃ মেনিলোও খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো, তিনি বললেন–যদিও মিঃ আলম আমার সঙ্গে মহৎ ব্যবহার দেখিয়েছে এবং বন্ধু বলে সমীহ করেছে, তবু আমি বাধ্য হবো তাকে পাকড়াও করতে কারণ সে একজন দস্যু।

রীনা আর বেশি কথা বাড়ালো না, সে নীরব রইলো।

মিঃ হুসাইন বললেন–যে কোনো সময় মিঃ আলম আপনার এখানে আসতে পারে, কাজেই আপনি সজাগ থাকবেন আর সে কারণেই এত রাতে আপনাকে

বিরক্ত করলাম।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো রীনা–মিঃ আলম আমার বাসায় আসবেন, এ কথা আপনারা ভাবতে পারলেন কি করে? একটু থেমে বললো সে–কারণ আমার চতুর্দিকে কড়া পুলিশ পাহারা চলেছে, মিঃ আলম আসতেই পারবেন না।

মিঃ হুসাইন বললেন–মিস রীনা, আপনি তাকে চেনেন কিন্তু তার আসল রূপ জানেন না, তাই ওকথা বলছেন। মিঃ আলম যে কত বুদ্ধিমান, কত চালাক তার প্রমাণ হলো ফাংহা প্রেসিডেন্ট ভবনের গোপন কক্ষের লৌহ আলমারী থেকে তাকে গ্রেপ্তার কারণে ঘোষিত পুরস্কার হীরকখন্ড চুরি.......

বলে উঠলেন মিঃ মেনিলো–চুরি নয়, ভোজবাজি বলা চলে। প্রেসিডেন্টের বাসভবনের গোপন কক্ষ থেকে হীরকখন্ড উধাও, এটা কম কথা নয়, একেবারে যাদুর ব্যাপার....যাক, এবার উঠা যাক, কি বলেন?

হাঁ, ঠিক বলেছেন–আচ্ছা চলি মিস রীনা? উঠে দাঁড়ালেন মিঃ হুসাইন।

রীনা মনে মনে বিরক্ত বোধ করছিলো, এতরাতে এরা বিরক্ত করতে এসেছেন কেন কে জানে।

চলে গেলেন মিঃ মেনিলো আর মিঃ হুসাইন।

রীনা দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো বিছানায়।

শহরের প্রতিটি অলিগলি সর্বস্থানে পুলিশ কড়া পাহারা দিচ্ছে। যে কোনো যানবাহন চলাকালে গাড়ি থামিয়ে গাড়ি চেক্ করা হচ্ছে।

বাদ পড়লো না মিঃ হুসাইনের গাড়িও।

মিঃ মেনিলো এবং মিঃ হুসাইন তাদের পরিচয় জানতেই ফাংহা পুলিশ গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিলো।

ওরা চলে গেলো রীনা আবার তলিয়ে গেলো গভীর চিন্তায়।

দুদিন কেটে গেলো মিঃ আলম এলেন না বা কোনো সংবাদ পাওয়া গেলো না তার। রীনা কিন্তু সব সময় মিঃ আলমের প্রতীক্ষা করে চলেছে।

তৃতীয় দিন আবার এলেন মিঃ হুসাইন, রীনাকে লক্ষ্য করে বললেন–দেখুন মিস রীনা, আপনাকে আমাদের সাথে কাজে নামতে হবে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার–ব্যাপারে আমাদের সাথে কাজে নামতে হবে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার–ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে চাই।

সেদিনও সঙ্গে এসেছিলেন মিঃ মেনিলো, তিনিও অনুরোধ জানালেন রীনাকে।

কিন্তু রীনা কিছুতেই রাজি হলো না।

বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন তারা।

ঐদিন রাতে রীনা যখন একা একা বসে বই পড়ছিলো, তখন হঠাৎ কে যেন এসে দাঁড়ায় তার পিছনে।

চমকে ফিরে তাকায় রীনা, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো সে–আপনি?

হাঁ, আমি মিস রীনা।

কিন্তু এত রাতে আপনি কেন এলেন মিঃ মেনিলো? একবার নয়, বারবার বলেছি আপনাকে আমি কোনোরকম সাহায্য করতে পারবো না!

আপনাকে করতে হবে।

না, আমি পারবো না।

কেন মিস রীনা?

মিঃ আলম দস্যু হতে পারেন কিন্তু তিনি আমার জীবনরক্ষক।

হলোই বা জীবনরক্ষক, তবুতো সে অপরাধী?

আমার কাছে তিনি মহান।

মিস রীনা।

বলুন?

মিঃ আলম আমার বন্ধু তবু কেন আমি তাকে গ্রেপ্তারের জন্য উন্মুখ হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি?

হয়তো অর্থের মোহ...

না।

তবে সুনামের জন্য।

তাও নয়।

তবে কিসের জন্য আপনি আপনার বন্ধুকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে উঠেপড়ে লেগেছেন?

কর্তব্য। কর্তব্যের খাতিরে।

তাই বলে আপনি...

হাঁ, মিস রীনা।

কিন্তু আমি আপনাকে কিছুতেই সাহায্য করতে পারব না। আপনি আর আসবেন না এ অনুরোধ নিয়ে। মিঃ আলম দস্যু, একথা আপনারা যতই বলুন, আমি স্বীকার করি না। আমি জানি তিনি একজন হৃদয়বান ব্যক্তি–শুধু তাই নন, তার চরিত্র দেবতুল্য। আমি বিশ্বাস করি, কোনো ব্যক্তি যদি মিঃ আলমের চরিত্রে চরিত্রবান হন তবে সে হবে মহাপুরুষ। মিঃ মেনিলো, আমি তার শুধু উপরের রূপটাই দেখিনি, জেনেছি তার ভিতরটা।

সত্যি আপনি মিঃ আলমকে এত বিশ্বাস করেন?

হাঁ, মিঃ মেনিলো।

মিস রীনা, তাহলে আপনি আমাদের কোনো উপকার করতে পারবেন না?

না না, বলেছি তো না।

যদি প্রচুর অর্থ পান, কিংবা ভাল চাকরি যা আপনার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেবে!

কোনো লোভ আমাকে বিচলিত করতে সক্ষম হবে না।

তাহলে ফিরে যাবো।

আপনি আমার পিতৃসমতুল্য, তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, নাহলে…একটু থেমে বললো রীনা, যান বলছি, আর আসবেন না এ ব্যাপার নিয়ে।

বেশ যাচ্ছি। মিঃ মেনিলো বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে মিঃ মেনিলোর গাড়িতে বসেছিলো মিঃ হুসাইন, তিনি মিঃ মেনিলোকে পাঠিয়েছিলেন। ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলেন–কি হলো, পারলেন মিস রীনাকে বাগাতে?

না, পারলাম না।

বলে গাড়িতে চেপে বসলেন মিঃ মেনিলো।

মিঃ হুসাইন বললেন রীনার দ্বারাই দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমি জানি, বনহুর রীনার কাছে আসবেই, কারণ মিস রীনা তার পথ চেয়ে আছে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

গোপনে চললো নানারকম আলোচনা। বিশেষ করে হীরকখন্ড হারানো ব্যাপার নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ফাংহা শহরের প্রতিদিন মহলে একটা ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

রীনা যখন কিছুতেই বনহুরকে গ্রেপ্তার ব্যাপারে পুলিশকে সহায়তা করতে নারাজ হলো তখন ফাংহা প্রেসিডেন্ট ভীষণ রেগে উঠলো।

অবশ্য রীনার সঙ্গে দস্যু বনহুরের যোগাযোগ আছে বা ছিলো তা জানতে পেরেছিলেন প্রেসিডেন্ট, তাই তিনি রীনাকে ডেকে পাঠালেন এবং না এলে তাকে জোরপূর্বক আনা হবে বলে জানালেন।

দু’জন পুলিশ অফিসার গেলেন প্রেসিডেন্টের আদেশবাণী নিয়ে। মিঃ হুসাইনও ছিলেন তাদের সঙ্গে।

রীনা মনে মনে খুব রাগান্বিত হলো কিন্তু পরিত্রাণ পেলো না সে–তাকে যেতেই হলো, কারণ প্রেসিডেন্টের হুকুম।

একেবারে প্রেসিডেন্ট ভবনে নিয়ে তাকে নানাভাবে বোঝানো হলো, অর্থের লোভ আগেই দেখানো হয়েছিলো–আবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা হলো, এমন কি ভয় দেখানো হলো, তবু রীনা মিঃ আলমের গ্রেপ্তার ব্যাপারে উৎসাহী হলো না।

প্রেসিডেন্টের নির্দেশে রীনাকে আটক করা হলো। তাকে বন্দীশালায় বন্দী করে রাখা হলো, জানানো হলো যতক্ষণ না মিস রীনা মিঃ আলমকে আটক করার ব্যাপারে সহায়তা না করবে, ততক্ষণ তাকে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে।

রীনা জানালো, আমি কিছুতেই মিঃ আলমকে গ্রেপ্তার করায় সাহায্য করতে পারবো না।

মিঃ হুসাইন জানিয়েছেন, রীনা যতক্ষণ না বনহুরকে গ্রেপ্তারের পুলিশবাহিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে ততক্ষণ তাকে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে।

রীনা তবু রাজি হলো না।

প্রেসিডেন্ট ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি রীনাকে কঠিন শাস্তি দেবার আদেশ দিলেন।

অবশ্য এ কাজ চললো গোপনে এবং কারাগার কক্ষের অভ্যন্তরে।

রীনা বললো–আমি মৃত্যুবরণ করবো তবু মিঃ আলমকে ধরিয়ে দিতে পারবো না।

রীনার হাত দু’খানা দু’পাশে বাঁধা হলো।

চোখ বাঁধা হলো, তারপর চললো তার উপর চাবুক দিয়ে আঘাত।

দস্যু বনহুরের সন্ধান না দেওয়ার জন্যই তাকে এভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।

কথাটা জানতে পারলো দস্যু বনহুর। সে বুঝতে পারলো তার জন্য রীনাকে কিভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।

বনহুর ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিলো কান্দাইয়ে তার আস্তানায় রহমানকে, সে যেন তাজকে নিয়ে স্থলপথে চলে আসে। রীনাকে ফাংহা কারাগার থেকে উদ্ধার করতে হবে এবং তাকে তার ছোট বোনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

বনহুর তার হাতঘড়িটার মধ্যে বসানো ছোট্ট ওয়্যারলেসটা ব্যবহার করলো অতি সন্তর্পণে। অবশ্য বনহুর তখন পুলিশ অফিসের একটা কক্ষে অবস্থান করছিলো। পুলিশ মহলের কেউ তাকে চিনতে পারেনি। আর তাকে চিনবেই বা কি করে, বনহুর তখন সম্পূর্ণ ছদ্মবেশে ছিলো।

রীনাকে নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়লো বনহুর, কারণ তাকে উদ্ধার করার পর একটা দিনও আর ফাংহায় নয়।

*

গভীর রাত।

নিস্তব্ধ কারাকক্ষ।

রীনার হাত দুখানা এখনও শিকলে বাঁধা আছে। মাথাটা কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়েছে একপাশে। কারণ সমস্ত দিন তার উপর চলেছে নির্যাতন। বেচারী রীনা.....একদিন যাকে উদ্ধারের জন্য পুলিশবাহিনী এবং সেনাবাহিনীদের সেকি আপ্রাণ চেষ্টা। গর্জিলাকে নিহত করার ব্যাপারে তারা মিঃ আলমকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন, আজ সেই পুলিশমহল ও সেনামহল মিঃ আলমকে গ্রেপ্তার করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এমন কি সেই কারণেই তার উপর চলেছে কঠোর নির্যাতন।

রীনা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, নানারকম ভীষণ আর ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাকে–মিস রীনা।

কে…কে আপনি! আপনি…মিঃ মেনিলো?

হাঁ।

এত রাতে কারাকক্ষে কেন? আপনিও কি আমার উপর নির্যাতন চালাবেন?

না।

তবে কেন এসেছেন?

আপনাকে বাঁচাতে....

না না, আমি আপনাদের কাউকে বিশ্বাস করি না।

কেন, আমার কি অপরাধ?

আপনিও আমাকে মিঃ আলমকে ধরিয়ে দেবার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।

সেটা আমার মনের কথা নয়।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো রীনা মিঃ মেনিলোর মুখের দিকে। সত্যি সে তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না সত্য কথা বলছে। বৃদ্ধ মেনিলোর কালো চশমার ফাঁকে চোখ দুটো দেখা গেলো না, তাই রীনা ভালভাবে বুঝতে পারলো না তার মনের কথাটা।

বললেন মিঃ মেনিলো– আমাকে বিশ্বাস করুন মিস রীনা।

না, আপনি আমাকে নতুন বিপদে ফেলবার মতলবে আছেন। কঠিন কণ্ঠে কথাগুলো বললো রীনা।

ঐ মুহূর্তে কোনো প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ শোনা গেলো।

মিঃ মেনিলো বললেন–ফিরে গেলাম। মনে রাখবেন, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।

মিঃ মেনিলো চলে গেলেন।

রীনার খুব কষ্ট হচ্ছিলো তবু সে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো মিঃ মেনিলো তাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন না নতুন কোনো বিপদে

ফেলবেন বলে এসেছিলেন।

কারাগারের লৌহকপাট আলগোছে বন্ধ হয়ে গেলো রীনার মুখের উপর এসে পড়লো লৌহকপাটের শিকের কালো দড়ির মত ছায়াগুলো।

ওপাশে আলো জ্বলছে, তারই ছায়া পড়েছে ওর মুখে।

রীনা ভাবছে ঐ মুখখানা...মিঃ আলম তাকে একবার নয়, কয়েকবার উদ্ধার করেছেন মহাবিপদ থেকে। যদি তিনি জানতে পারেন রীনা বন্দিনী, তাহলে নিশ্চয়ই চুপ থাকতে পারবেন না, একথা জানে রীনা।

ঐ ভরসা নিয়েই রীনা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে চললো।

দুদিন কেটে গেলো।

রীনা মরণাপন্ন হয়ে উঠেছে, তাকে নির্মমভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে, তবু সে রাজি হয় মিঃ আলমকে ধরিয়ে দিতে।

ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়েছে রীনা।

সেদিন মিঃ হুসাইন এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার এসেছেন রীনার বন্দীশালার! আর এসেছেন মিঃ মেনিলো। মিঃ হুসাইন কঠিন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মিস রীনা, এখনও সময় আছে যদি আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে পুলিশবাহিনীকে সহায়তা করবেন বলে রাজি হন তাহলে জীবনরক্ষা পাবেন, নইলে এই অন্ধকারকক্ষে আপনাকে তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

রীনার মুখোভাব পূর্বের ন্যায় দৃঢ়, সে তেমনি দীপ্তকণ্ঠে বললো–আমি মৃত্যুবরণ করবো তবু আপনাদের কাজে সহায়তা করতে পারবো না।

সত্যি বলছেন মিস রীনা? বললেন মিঃ হুসাইন।

বললো রীনা–হাঁ সত্যি।

কিন্তু জানেন এর পরিণতি কি?

জানি এবং একটু পূর্বেই আপনি নিজ মুখে বলেছেন–মৃত্যু আমার অনিবার্য।

হাঁ, তবু আপনি……

আমাকে আপনারা কোনো শাস্তি দিয়েই রাজি করাতে পারবেন না।

বেশ, তাহলে থাকুন এভাবে। দাতে দাঁত পিষে বললেন মিঃ হুসাইন।

মিঃ মেনিলো বললেন–মিস রীনা, রাজি হয়ে যান, এতে আপনার মঙ্গল আছে।

না, আপনারা আমাকে কোনো কিছুতেই ভোলাতে পারবেন না। মিঃ আলম অপরাধী নন, কেন আমি তাকে আপনাদের হাতে তুলে দেবো বা ধরিয়ে দেবো। পারবো না এমন নির্মম কাজ করতে……

রীনার গন্ড বেয়ে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু।

মিঃ হুসাইন বললেন–আপনি কাকে অপরাধী নন বলছেন মিস রীনা?

মিঃ আলমকে।

যে লক্ষ লক্ষ মানুষের আতঙ্ক, যার ভয়ে মানুষ সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, যাকে দেখলে মানুষ শিউরে উঠে, যে মানুষের ধনরত্ন ছিনিয়ে নেয় অস্ত্রের মুখে……

না না সব মিথ্যা, সব মিথ্যা……তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের আতঙ্ক নন তিনি যাদের আতঙ্ক তারা মানুষ নয় অমানুষ, যারা দুঃস্থ অসহায় মানুষের অভিশাপ মিঃ আলম তাদের শত্রু। তার ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকে কারা–ঐসব মানুষ যারা অসহায় মানুষের রক্ত শোষণ করে পৃথিবীর বুকে স্বনামধন্য মানুষ নামে পরিচিত হয়েছে। তাকে দেখলে শিউরে উঠে কারা–তারা সাধারণ ব্যক্তি না, তারা হলো ওরা, যারা ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে তুলেছেন পরের ধন আত্মসাৎ করে। আর যাদের ধনরত্ন তিনি ছিনিয়ে নেন অস্ত্রের মুখে, তারা সব মানুষ নয় অমানুষ, জানোয়ার, পশু,…..কাজেই অন্যায় তিনি করেন না বা করেননি,…..

মিস রীনা।

হাঁ, আপনারা গভীরভাবে তলিয়ে ভেবে দেখুন অন্যায়–অনাচারে লিপ্ত আছে কারা? আপনারা পুলিশমহল–ন্যায়নীতি আপনাদের ধর্ম, কাজেই আপনাদের অভিযান হবে অন্যায়–অনাচারের বিরুদ্ধে তারা যারাই হোন না কেন, অন্যায়

অনাচারকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিন, তাদেরকে আটক করুন, প্রয়োজন হলে মৃত্যুদন্ড দিন। দস্যু বনহুর সৎ–মহৎ ব্যক্তির সম্পদ কেড়ে নেন না। কেন আপনারা দেশের শত্রু যারা তাদের না পাকড়াও করে মিছেমিছি একটা মহান ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছেন....।

মিস রীনা, বন্দী অবস্থা আপনার মুখে এ ধরনের উক্তি শোভা পায় না। তা ছাড়াও আপনার স্পর্ধা বেড়ে গেছে চরমভাবে।

যা সত্যি তাই আমি বলছি, আপনারা আমাকে যা খুশি করতে পারেন, আমি এতটুকু দুঃখ পাবো না। কিন্তু অন্যায়কে আমি মেনে নেবে না। দেখুন আপনারা দেশের রক্ষক, কারণ পুলিশবাহিনী দেশকে অভিশাপমুক্ত করতে সদা প্রস্তুত...

চুপ করুন মিস রীনা, আপনার কাছে আমরা হিতোপদেশ শুনতে আসিনি। মনে রাখবেন, আপনি যত মহৎ কথাই বলেন না কেন, আমাদের কাজে সাহায্য করতে সম্মতি না জানালে মুক্তি পাবেন না।

রীনা নীরব রইলো।

মিস হুসাইন তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলো কারাকক্ষ থেকে। আবার মিস রীনার চোখে নেমে এলো জমাটা অন্ধকার।

রাত বাড়ছে।

প্রহরীর ভারী বুটের খট খট আওয়াজ অন্ধকার কারাকক্ষের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে জমাট অন্ধকারকে আরও থমথম করে তুলছে।

রীনার দু'চোখ ক্লান্তি আর অবসাদে ভরে উঠেছে! মাঝে মাঝে নিদ্রায় ঢলে পড়েছে ওর মাথাটা কাঁধের একপাশে। এতক্ষণ প্রহরীর ভারী বুটের আওয়াজ তাকে সজাগ করে তুলছিলো। এখন সে ঝিমিয়ে পড়েছে নিদ্রার কোলে।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায় প্রহরীর পিছনে।

প্রহরী চমকে ফিরে তাকাতেই থমকে দাঁড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি বাম হাতে প্রহরীর মুখ চেপে ধরে ডান হাতের রিভলভার তার বুকে চেপে ধরে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—খুলে দাও কারাগারের দরজা!

এ্যা, কি বলছো তুমি? কে, কে তুমি?

আমি দস্যু বনহুর।

এ্যা।

খুলে দাও কারাগারের দরজা।

চলো বাবা খুলে দিচ্ছি, তবুও আমাকে মেরো না।

চলো! বনহুর বললো।

বনহুর আর প্রহরী দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো।

তখনও বনহুরের রিভলভার ঠেকে আছে প্রহরীর বুকে! ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে প্রহরীর মুখে। জানে সে, দস্যু বনহুর কত ভয়ঙ্কর। যদি সে একটু নড়াচড়া করে তাহলেই হয়েছে, রিভলভারের গুলীটা তার বুক ভেদ করে চলে যাবে, তাই নীরবে কাজ করতে এগিয়ে এলো সে।

লৌহকপাট খুলে দিলো প্রহরী।

কারাকক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। কিন্তু তার পূর্বে প্রহরীর হাত-পা বেঁধে ফেললো মজবুত করে। যেন সে একচুলও নড়তে না পারে।

প্রহরীকে বেঁধে ফেলে রাখলো আড়ালে, যেন সহসা কেউ তাকে দেখতে না পারে। বনহুর কারাকক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো–মিস রীনা!

কারাকক্ষ আধো অন্ধকার থাকায় ভালভাবে সে দেখতে পেলো না, বললো কে?

আমি দস্যু বনহুর।

আপনি! আপনি মিঃ আলম।

হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি চলুন।

কোথায়?

কারাগারের বাইরে।

কিন্তু হাত যে বাধা রয়েছে। কি করে আমি বাইরে যাবো মিঃ আলম?

আমি আপনাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। বনহুর কথাটা বলে রীনার হাত দু'খানা দ্রুতহস্তে মুক্ত করে দেয়, তারপর বলে–আসুন, আর একদন্ড দেরী করা উচিত হবে না।

রীনা বললো–চলন। কিন্তু আমি যে ঠিকমত চলতে পারছি না। আমি আপনাকে চলায় সাহায্য করছি। বনহুর রীনাকে ধরে নিলো, তারপর বেরিয়ে এলো কারাকক্ষের বাইরে।

অবাক হলো রীনা, সমস্ত প্রহরী সবাই ঘুমাচ্ছে, ব্যাপার কি? রীনার কানে মুখ নিয়ে বললো বনহুর সবাইকে আমি ঘুমিয়ে দিয়েছি।

আপনি? আপনি কি দুঃসাহসী মিঃ আলম।

পরে কথা হবে, এখন চলুন।

একেবারে কারাগারের প্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। তারা।

অদূরে লাইটপোষ্টের আলোতে রীনা মিঃ আলমকে আজ নতুন পোশাকে দেখলো। অদ্ভুত জমকালো পোশাক, বড় সুন্দর লাগছে তাকে।

একটু হাসলো বনহুর, সে বুঝতে পারলো রীনা তাকে পেয়ে কারাগারের সব ব্যথা, সব বেদনা ভুলে গেছে।

বনহুর বললো–বাইরে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে এক্ষুণি আবার পূর্বস্থানে ফিরে যেতে হবে, কাজেই আসুন মিস রীনা?

কোথায় যাবো–বাসায়?

না, সেখানে গেলে পরিত্রাণ নেই, আবার ফিরে আসতে হবে ফাংহা কারাগারে, কাজেই ফাংহা থেকে শেষ বিদায় নিয়ে যেতে হবে মিস রীনা। কিন্তু তার পুর্বে কিছু কাজ আছে আমার, যা আমাকে সমাধা করে যেতে হবে।

হঠাৎ এ মুহূর্তে কারাগারের বিপদসংকেত ঘন্টা বেজে উঠলো। পুলিশ ভ্যানগুলোতে চেপে বসলো সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স, অন্ধকার রাতের রাজপথ আলোকিত হয়ে উঠলো পুলিশ ভ্যানের আলোতে।

বনহুর রীনাকে নিয়ে একটা দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে ফেললো।

পুলিশ ভ্যানগুলো তাদের সম্মুখ রাজপথ দিয়ে সা সা করে চলে গেলো।

কারাগারে বিপদসংকেত ঘন্টা বেজেই চলেছে।

বনহুর তখন রীনার হাত ধরে একরকম প্রায় টেনেই নিয়ে চললো আড়ালে আত্মগোপন করে। কখনও বা দেয়ালের আড়ালে, কখনও বা গাছের গুঁড়ির আড়ালে, কখনও বা লাইটপোষ্টের পিছন দিক দিয়ে এক সময় নির্জন এক স্থানে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

শিষ দিলো সে ঠোঁটের মধ্যে দুটো আংগুল রেখে।

অমনি অন্ধকারে একটা জমকালো অশ্ব এসে দাঁড়ালো সেখানে।

বনহুর বললো–মিস রীনা, অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসুন, শিগগির পালাতে হবে। ঐ শুনুন পুলিশ ভ্যানগুলো এদিকে আসছে।

রীনা নিজেও শুনতে পাচ্ছে ভ্যানের আওয়াজ। সে একটু দেরী না করে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো, অবশ্য বনহুরের সাহায্যেই রীনা অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতে সক্ষম হলো।

ততক্ষণে পুলিশ ভ্যানগুলো আরও নিকটে পৌঁছে গেছে।

বনহুর একদন্ড দেরী না করে উঠে বসলো রীনাকে সম্মুখে রেখে। তারপর অশ্বের লাগাম চেপে ধরলো কঠিন হাতে।

উল্কাবেগে ছুটলো তাজ।

ওদিকে পুলিশ ভ্যানগুলো থেকে পুলিশ বাহিনী বুঝতে পারলো এ অশ্ব কারও নয়, দস্যু বনহুরের এবং সেই মিস রীনাকে নিয়ে ভেগেছে।

গাড়িগুলো অশ্বপদশব্দ লক্ষ্য করে তীরবেগে চললো।

পুলিশ বাহিনীর হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। তারা প্রস্তুত হয়ে আছে, যেমনি তাদের লক্ষ্যের সীমানার মধ্যে আসবে দস্যু বনহুর অমনি গুলী ছুড়বে।

ওদিকে রীনাকে সম্মুখে রেখে বনহুর তাজকে নিপুণভাবে চালনা করে চলে। ক্রমেই শহর ছেড়ে গভীর জঙ্গলপথ। দু'ধারে শুধু বৃক্ষরাজি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। পথের দু'পাশে জঙ্গল, শুধু জঙ্গল নয়, একেবারে গহন বন।

বনহুর দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করে চলেছে।

পুলিশ ভ্যানগুলো কিছুতেই অশ্বটার নাগাল পাচ্ছে না। তারা পুলিশ ভ্যান থেকে ওয়্যারলেসে পুলিশ অফিসে জানিয়ে দিচ্ছে তাদের গাড়িগুলোর নাগালের বাইরে রয়েছে অশ্বটা কাজেই তারা শুধু অশ্বপদশব্দ লক্ষ্য করে এগুচ্ছে কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

পুলিশ অধিনায়ক জানালেন, তোমরা দস্যু বনহুর এবং মিস রীনাকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় পাকড়াও করে আসবে। তোমাদের লক্ষ্যের ভিতরে এলেই তোমরা গুলী ছুড়বে এবং ঝাঁঝরা করে দেবে বনহুর ও তার সঙ্গিনীকে।

পুলিশ বাহিনী জানালো, আমরা জান দিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, বনহুর কিছুতেই মিস রীনা সহ পালাতে সক্ষম হবে না।

পুলিশ অধিনায়ক বললেন, আমি তোমাদের বিজয় চাই। তোমরা ফাংহা পুলিশ বাহিনী, নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হবে বলে আশা করছি।

এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলো বনহুর আর রীনা সহ তাজ যে জায়গাটা ভীষণ উঁচু আর খাড়া। মাঝখানে বিরাট ফাটল, ওপারে আবার পথ।

কোন এক ভূমিকম্পে পথটা ধসে পড়ায় এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এপথে একদিন তোকজন চলাচল করলেও আজ আর এপথে কেউ ভুল করেও আসে না!

বনহুর লাগাম টেনে ধরলো।

থেমে পড়লে তাজ।

ওদিকে পুলিশ ভ্যানগুলোও এসে গেছে নিকটে। গাড়ির সার্চলাইটের আলো এসে পড়েছে তাজের শরীরে।

বনহুর বললো–মিস রীনা, আপনি পুলিশের হাতে নিজকে সমর্পণ করতে চান, না মৃত্যুবরণ করতে চান? কারণ আমাদের সম্মুখে যে ফাটল রয়েছে তা অত্যন্ত বিপদজনক। পুলিশ ভ্যানগুলো যে ভাবে এগিয়ে আসছে তাতে ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দু'জনার অতি নিকটে পৌঁছে যাবে। ওরা আমাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুড়বে তাতে আমাদের দেহে গুলী বিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আমাদের সম্মুখে দুটি পথ রয়েছে, একটি পুলিশের নিকট আত্নসমর্পন আর একটি ঐ ফাটলে মানে গভীর খাদে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ…বলুন মিস রীনা, কোনটা আপনি চান?

পুলিশের হাতে ধরা দিতে আমি চাই না মিঃ আলম, আপনি আমাকে মৃত্যু গহ্বরে নিক্ষেপ করুন……

সত্যি আপনি মৃত্যুভয় পান না মিস রীনা?

না।

আচ্ছা, মিস রীনা, আমাকে শক্ত করে ধরুন যেন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ছিটকে না পড়েন।

কথাগুলো এত দ্রুত বললো তারা যা মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো।

ওদিকে পুলিশ ভ্যানগুলোর তীব্র আলোর ছটা তীরবেগে ছুটে আসছে।

বনহুরের জামাটা শক্ত করে ধরে চোখ বুজলো রীনা।

বনহুর ওকে বাম হাতে এঁটে ধরে জান হাতে অশ্বের লাগাম টেনে ধরলো। বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে পড়লো ফাটলের ওপারে।

অবশ্য তাজ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো বটে।

বনহুর আর রীনা ঠিক বসে আছে তার পিঠে।

রীনা চোখ মেললো।

বনহুর বললেন–বেঁচে গেছি রীনা, খোদাকে ধন্যবাদ।

মিঃ আলম!

চোখ মেলো ঐ দেখো রীনা ভোর হয়ে এসেছে।

বনহুর তাজের লাগাম ধরতেই তাজ আবার ছুটতে শুরু করলো। কিন্তু বেশি দূর আর এগুতে হলো না, সম্মুখে একটা প্রশস্ত জায়গা নজরে পড়লো।

বনহুর আর রীনা এবার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো।

বললো বনহুররীনা, ওরা আর আমাদের পাকড়াও করতে পারবে না। আমরা ওদের সীমানার বাইরে চলে এসেছি।

*

কি সুন্দর জায়গাটা, তাই না?

হাঁ মিস রীনা।

মিস নয় শুধু রীনা বলুন, একটু আগে যা বলেছিলেন আর আপনি নয় তুমি বলুন।

আচ্ছা, তাই বলবো এখন থেকে।

মিঃ আলম আপনি সত্যি অদ্ভুত পুরুষ। ভেবেছিলাম এই আমাদের শেষ যাত্রা কিন্তু……

বেঁচে গেছি…বনহুর হেসে বললো।

কি আশ্চর্য এই জীবন।

ফাংহা পুলিশবাহিনীর পরাজয় তোমার জীবনকে আশ্চর্যময় করে তুলেছে! মানুষ যা ভাবে ঘটে তার বিপরীত। ফাংহা পুলিশ মহল তোমাকে বন্দী করে আমাকে পাকড়াও করবে ভেবেছিলো কিন্তু তা হলো না, পুলিশবাহিনীর চরম পরাজয় হলো।

আমাদের জীবনকে করে তুললো অক্ষম অমর।

রীনা!

বলুন?

কিন্তু এখানে আর কতদিন এভাবে কাটানো যাবে, বলো?

এই তো মাত্র দুটো দিন কেটেছে...

দুটো দিন আমার কাছে অনেকদিন মনে হচ্ছে রীনা। তোমাকে তোমার বোনের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

অদূরে তাজ ঘাস খাচ্ছিলো।

বনহুর পা পা করে এগিয়ে চললো অশ্ব তাজের দিকে।

রীনাও চলে তার সঙ্গে।

ওরা কথা বলছিলো।

জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন। চারিদিকে ঘন জঙ্গল মাঝখানে কিছুটা নিচু জায়গা, সমতলও বটে। ওপাশে বিরাট উঁচু টিলা মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে, যার উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো বনহুর রীনাসহ নিচে।

তাজের মত দক্ষ অশ্ব বলেই রক্ষা পেয়েছে বনহুর আর রীনা।

রীনা তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো।

বিরাটদেহী অশ্বটার দিকে তাকিয়ে রইলো রীনা অবাক চোখে। যেমন দস্যু বনহুর তেমনি তার অশ্ব।

বনহুর বললো–তাজ ছিলো ফাংহা পুলিশবাহিনীর কবল থেকে তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি রীনা।

হাঁ, আমিও তাই ভাবছি।

কিন্তু এমন করে ক'দিন কাটাবে বলো? শুধু গাছের ফল আর ঝরণার পানি পান করে কেউ বাঁচতে পারে?

আমার কিন্তু বেশ লাগছে, নেই কোনো কোলাহল, নেই কোনো মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ……

ঠিক আমার বিপরীত তুমি

আমি কিন্তু নির্জনতা ভালবাসি মিঃ আলম।

আমি ভালবাসি ঝড়ঝঞ্ঝা আর…

বলুন, থামলেন কেন?

আজ আর নয়, বলবো পরে। এখন কাজের কথা হোক, কেমন

বলনু।

কিছু শুকনো খাবার দরকার তা ছাড়াও দরকার আগুনের। রীনা, তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। দেখি যদি কোনোকিছু পাওয়া যায়। একটু আগুন পেলেও আপাতত বাঁচা যেতো। সঙ্গে রিভলভার আছে, ছোরা আছে যা দিয়ে অন্যায়কারীদের সায়েস্তা করেছি, এবার তাই দিয়ে করবো নিরীহ জীব বধ, তারপর ছোরা দিয়ে মাংস কেটে আগুনে সেদ্ধ করে খাবো।

চলে যায় বনহুর।

তাজ তখনও একমনে ঘাস খেয়ে করে চলেছে।

রীনা বারণ করতে পারে না, কারণ তারও ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিলো। আশেপাশে অনেক হরিণ নজরে পড়েছে কিন্তু হরিণ হত্যা করে তার কাঁচা মাংস খেতে পারবে না, তাই এ দু'দিন বনহুরের ইচ্ছা থাকলেও হরিণ বধ করেনি, প্রথমে চাই আগুন।

পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো, যায় কিন্তু তেমন পাথরখন্ড আশেপাশে কোথাও নেই যা দিয়ে তারা আগুন জ্বালতে পারে। বিরাট আকার পাথরখন্ডগুলো এক একটা ছোটখাটো পাহাড় যেন তাই আগুন জ্বালার কোনো উপায় খুঁজে পায়নি বনহুর বা রীনা।

রীনা বনহুরের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বহুক্ষণ কেটে যায়, ফিরে আসে না বনহুর। রীনা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

এখানে পৌঁছার পর তারা একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো। গুহাটা একেবারে ছোট নয়, বেশ বড়ও নয়, মাঝারি।

মাঝখানে দেয়ালের মত একটা পাথর থাকায় পৃথক দুটো কক্ষের মত তৈরি হয়েছিলো, তাই বনহুর আর রীনা খুশি হয়ে ঐ গুহাটা বেছে নিয়েছিলো আপাতত বসবাসের জন্য।

রীনা গুহায় ফিরে এসে বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে, কারণ এ জায়গা সম্পূর্ণ নির্জন, তাছাড়া নানা হিংস্র জীবজন্তুর ভয় আছে। ক্রমেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তাজও চলে গেছে দূরে কোথাও, তাকেও আর খুঁজে পাচ্ছে না রীনা। তাজ থাকলে তবু যেন একটা সাহস ছিলো তার।

যতই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে ততই রীনা অধৈর্য হয়ে উঠছে। কেন সে মিঃ আলমকে যেতে দিয়েছিলো তখন? কেন সে নিজে গেলো না তার সঙ্গে যা ঘটতে উভয়ের ভাগ্যেই ঘটতো, কেউ কারও জন্য প্রহর গুণতো না।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো।

চমকে মুখ তুললো রীনা, বিস্ময়ে হতবাক হলো এবং ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লো, সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো–আপনি এখানে কি করে এলেন মিঃ মেনিলো?

আপনাদের সন্ধানে।

আমাদের সন্ধানে?

হাঁ।

মিঃ মেনিলো, আপনার পায়ে পড়ি আমাদের আপনি পুলিশের হাতে তুলে দেবেন না। আপনি আমার পিতৃতুল্য। এই অসময়ে আপনি এসে আমাকে ভয় মুক্ত করলেন।

কিন্তু আমি বেশিক্ষণ থাকবে না, একটা কথা বলে বিদায় নেবো।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এ অসময়ে আপনি কোথায় যাবেন? দোহাই আপনার, আমাকে একা ফেলে আপনি যাবেন না।

তবে চলুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

ফাংহা শহরে।

না না, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবেন না।

যদি বাঁচতে চান তবে আমি যা বলছি তাই করুন। আপনি আমাকে যাই মনে করুন আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী….

জানি! আর জানি বলেই আপনাকে বিশ্বাস করেছি প্রথম থেকেই। বলুন কি করে এখানে এলেন?

অনেক কষ্ট করে। পুলিশবাহিনী আপনাকে এবং মিঃ আলমকে খুঁজে ফিরছে। তারা এখানেও এসে পড়তে পারে, কাজেই আপনি ও মিঃ আলম যত শীঘ্র পারেন এইস্থান ত্যাগ করে চলে যান। মোটেই আর বিলম্ব করবেন না যেন।

আচ্ছা তাই করবো, কিন্তু মিঃ আলম এখনও তো ফিরে এলেন না।

তিনি কোথায় গেছেন?

কিছু খাবারের সন্ধানে।

এসে যাবে হয়তো। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, নইলে রাতে আমি ভাল চোখে দেখি না কিনা। হাঁ, আবার বলে যাই, পুলিশ পই পই করে খুঁজছে, জঙ্গল চষে ফিরছে, কাজেই যত শীঘ্র পারেন এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবেন।

আপনি থেকে গেলে খুশি হতাম মিঃ মেনিলো, আপনি আমার গুরুজন......

না না, এতে আপনাদের অমঙ্গল হবে, কারণ আমাকে খুঁজতে এসে পেয়ে যাবে আপনাকে আর আমার সেই বন্ধুকে। যদিও তার সঙ্গে আমার বেশি হৃদ্যতা জমে উঠেছিলো না, তবুও আমি তার অমঙ্গল কামনা করতে পারি না। যাই এবার......

কিন্তু এই গহন জঙ্গলের ধারে নির্জন স্থানে আমাকে একা ফেলে চলে যাবেন আপনি?

উপায় নেই তাই যাচ্ছি মিস রীনা, নইলে আপনিও বিপদে পড়বেন, হয়তো আমিও জড়িয়ে পড়বে। আপনার সঙ্গে। চলি তাহলে? বাই বাই.......

চলে গেলেন মিঃ মেনিলো।

এই অজানা অচেনা স্থানে এবং বহুদূরে কি করে এলেন মিঃ মেনিলো? তদুপরি তিনি বৃদ্ধ, রীনা অবাক হয়ে ভাবছে। কেটে গেলো বেশ কিছুক্ষণ। ক্রমেই রাতের অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসছে। ভয়ে শিউরে উঠছে রীনার শরীরের লোমগুলো।

বাতাস বইতে শুরু করেছে।

ঠান্ডায় জমে আসছে দেহের রক্ত।

রীনা গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো, মনে মনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছে।

এমন সময় ফিরে এলো বনহুর।

তার পাগড়ীর আঁচলে কিছু ফলমূল। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলো–রীনা!

কে, মিঃ আলম আপনি এসেছেন?

হাঁ রীনা।

ইস বাঁচালেন। কি দুশ্চিন্তায় না পড়েছিলাম। ভয়ে বুকটা এখনও টিপ টিপ করছে।

বনহুর বললো–এই নাও কিছু ফলমূল এনেছি। খেয়ে নাও।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বলুন তো?

এইসব সংগ্রহ করতে সময় কাটলো। তাজকে দেখছি না, সে কোথায় রীনা?

জানি না। আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পর সেও উধাও হয়েছে। জানেন মিঃ মেনিলো এখানেও এসেছিলেন।

চমকে উঠলো যেন বনহুর, তারপর বললো–মিঃ মেনিলো এখানে এসেছিলেন বল কি রীনা?

হাঁ, তিনি এসেছিলেন, বললেন অনেক খুঁজে খুঁজে তারপর আমাকে পেয়েছেন।

আমরা জীবিত আছি, একথা তিনি মনেই বা করলেন কি করে? নিশ্চয়ই তিনি আমাদের সন্ধান জেনে নিয়ে পুলিশ মহলকে জানাবেন এবং আমাদের ধরিয়ে দিয়ে লক্ষ টাকা পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

না তা নয়, বৃদ্ধ অতি ভদ্র এবং মহৎ বলে আমার মনে হয়েছে, কারণ তিনি যা বললেন তা আমাদের হিতাকাক্ষী হিসেবেই বললেন।

কি বললেন তিনি?

বললেন, এখানে আপনারা আর একটা দিনও বিলম্ব করবেন না, কারণ পুলিশ বাহিনী আপনাকে এবং মিঃ আলমকে খুঁজে ফিরছে। তারা এখানেও আসতে পারে, আমি চাই না আমার বন্ধু মিঃ আলম আর আপনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

হাঁ, তা সত্যি। মিঃ মেনিলা আমার বন্ধুলোকই বটে তাই তো আমি তাকে আমার প্রিয় আংটি উপহার স্বরূপ দিয়েছি। একটু থেমে বললো বনহুর তাহলে কাল ভোরেই আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো, কি বলো?

তাই ভালো। কিন্তু আপনার অশ্বটা যে কোথায় গেলো বুঝতে পারছি না। যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে।

না, তাজ হারাবে না। আমি শিস দিলেই সে যেখানেই থাক চলে আসবে।

সত্যি, আপনার অশ্বটাও আপনার মতই অদ্ভুত অপূর্ব, যার কোন তুলনা হয় না।

চল ভিতরে যাই কিন্তু যা অন্ধকার গুহার মধ্যে!

হাঁ, বড় অন্ধকার।

আকাশে অনেক তারা, এসো রীনা এখানেই বসি। বসে বসে ফলগুলো খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করি।

রীনা আর বনহুর পাশাপাশি বসলো।

নির্জন স্থানে শুধু দুটি মানুষ–একজন পুরুষ আর একজন নারী। যে কোনো দুষ্টমতি ব্যক্তির মনেই নানা কুমতলব আসতে পারে কিন্তু বনহুর অদ্ভুত সংযমী পুরুষ, তাই সে এতটুকু বিচলিত হলো না বা হয়নি কোনো সময়।

এক সময় বনহুর বললো–যাও রীনা, এবার গুহায় গিয়ে ঘুমাও।

আর আপনি?

আমি পাহারা দেবো।

তা হয় না, এ দুটো দিন যেমন কেটেছে, আপনি এপাশে আর আমি ওপাশে, আজও তেমনি কাটবে।

যদি ফাংহা পুলিশবাহিনী এসে পড়ে তাহলে দু'জনই ধরা পড়ে যাবো। আরবার সেই বন্দীশালা……

আমার কষ্ট আপনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, এখনও করেন, সত্যি আমার জন্য আপনার কত চিন্তা!

হাঁ, আমার একটা কথা রীনা, সেই গর্জিলার হাতে পড়বার পূর্বে আমরা মানে তুমি যে সম্পদ হারিয়েছিলে তা আমি উদ্ধার করে এনেছি।

সে কি!

হাঁ, গর্জিলা যখন তোমাকে হাতের মুঠায় তুলে নিয়েছিলো, তখন তোমার হাতের মুঠা থেকে খুলে পড়েছিলো সেই পুটলিটা। আমি তা নিয়ে একটা গর্তে লুকিয়ে রেখে পাথরচাপা দিয়েছিলাম।

আপনি এখানে তা পেলেন কি করে মিঃ আলম?

পেলাম মানে তাজের পিঠে চেপে গিয়েছিলাম। যে জায়গায় তোমার হাত থেকে সেই পুঁটলিটা খসে পড়েছিলো সে জায়গা বেশি দূর নয়, তাই আমি ওটা আনতে পেরেছি রীনা। এই নাও, ওটা ভাল করে রেখে দাও, কাজে আসবে।

রীনা হাত বাড়িয়ে সেই ছোট পুঁটলিটা নিলো এবং আনন্দভরা কণ্ঠে বললো–কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাচ্ছি না।

থাক, ধন্যবাদ পরে হবে। এবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করো, ভোরেই আমরা রওনা দেবে এখান থেকে।

পরদিন বনহুর আর রীনা রওনা দিলো রীনার দেশের উদ্দেশ্যে। কত বন প্রান্তর আর নদী পেরিয়ে একসময় বনহুর আর রীনা এসে পৌঁছলো রীনার দেশে!

যে পথ লোক অতিক্রম করে ট্রেনে বা প্লেনে কিংবা জাহাজে, ঐ পথ এলো তারা তাজের পিঠে।

বহুদিন পর রীনা তার ছোট বোনকে পেয়ে যেমন খুশি হলো তেমনি খুশি হলো রীনার ছোট বোন মীনা। ছোট বোন মীনা জড়িয়ে ধরলো রীনাকে, আর রীনা জড়িয়ে ধরলো ওকে। মীনা বললো–দিদি, তুমি বেঁচে আছে একথা আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। জানো আমরা সবাই জানি তুমি মরে গেছো।

রীনা রুদ্ধ কণ্ঠে বললো–তোরা যা ভেবেছিলি তাই সত্য হতো যদি না উনি আমাকে রক্ষা করতেন। মীনা, উনি আমার জীবনরক্ষক।

ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো বনহুর, রীনা আংগুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিলো।

মীনা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো এবং দু'হাত জুড়ে নমস্কার করলো।

বনহুর মৃদু হাসলো।

রীনা আর মীনা যখন আনন্দে আত্মহারা তখন আলগোছে সরে পড়লো বনহুর।

ওরা আর তাকে খুঁজে পেলো না।

গভীর চিন্তায় ভেঙে পড়লো রীনা, একেবারে কেঁদেকেটে অস্থির হলো সে। মিঃ আলমের অন্তর্ধান তাকে সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলো।

মীনা কিছুতেই রীনাকে প্রবোধ দিতে পারছে না।

দুদিন কেটে গেলো মুখে দানাপানি দেয় না রীনা।

মীনা ওকে বুঝায়, তিনি পথের মানুষ, তাকে কি করে ধরে রাখতে সাহস করো দিদি

না, তিনি পথের মানুষ নন। মীনা, তুই বুঝবি না তিনি আমার কত আপন জন। দীর্ঘকাল ধরে আমি তাকে দেখেছি, চিনেছি, জেনেছি..

কিন্তু দিদি, তুমি তাকে বোঝোনি, তোমার কথায় আমি বুঝেছি তিনি সাধারণ মানুষ নন। তাকে তুমি কোনোদিন ধরে রাখতে পারবে না। তিনি তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরে…

বোন যতই বুঝায় ততই রীনার চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়। কেঁদে কেঁদে পাগলিনী প্রায় হয়ে পড়লো সে, কিছুতেই তাকে প্রবোধ দেওয়া যাচ্ছে না।

এমন সময় ঝি এসে জানালো–মীনা দিদি, এক বুড়ো মানুষ এসেছেন, তিনি বড় আপার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মীনা বললো–দিদি, বুড়ো মানুষ কে যিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

জানি না কে তিনি। আচ্ছা আসতে বল।

এলো বৃদ্ধ লোকটা।

রীনা বিস্ময়ে চমকে উঠলো–আপনি এখানে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি মিঃ মেনিলো?

স্বপ্ন নয়, সত্য।

কি করে এলেন?

তাহলে মনে করুন ফাংহা পুলিশবাহিনীও আপনার সন্ধানে আসতে পারে।

না না, আমি বিশ্বাস করি না। ফাংহা পুলিশবাহিনী কি করে জানবে আমি এখানে এক ভিন্ন দেশে এসেছি।

সব জানে তারা। এবার শুনুন তবে কেন আমি এসেছি।

বলুন?

আপনার বোন মিস মীনাকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে বলুন।

আচ্ছা। কথাটা বলে মীনা বেরিয়ে গেলো।

মিঃ মেনিলো বললোমিছামিছি কেন কান্নাকাটি করছে রীনা!

কি আপনি…আপনি..আপনিই মিঃ আলম।

না, আমি দস্যু বনহুর।

হাঁ। বনহুর নিজের মুখ থেকে দাড়িগোঁফ খুরে ফেলে বললো– রীনা, আমাকে বিদায় দাও বোন? আমি এতদিন তোমাকে হেফাজতে রেখেছিলাম, তোমাকে তোমার বোনের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি, এটাই আমার পরম আনন্দ।

বোন! আমাকে যখন আপনি বোন বলেই মেনে নিয়েছেন। তবে কোনোদিন যেন আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই।

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তাহলে আজ বিদায় দাও রীনা? বলল, আমার জন্য আর চোখের পানি ফেলবে না?

আচ্ছা, তাই হবে….

বনহুর পুনরায় দাড়িগোঁফ মুখে লাগিয়ে মিঃ মেনিলোর ড্রেসে বেরিয়ে গেলো।

রীনা নীরবে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

মীনা এসে দাঁড়িয়েছে রীনার পাশে–কে উনি দিদি?

আমার এক ভাই! কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো।

ততক্ষণে মিঃ মেনিলোর বেশে দস্যু বনহুর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

*

ফাংহা পুলিশবাহিনী প্রধান এবং মিঃ হুসাইন ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার সবাই বুঝতে পেরেছেন বন্দীশালা থেকে রীনাকে নিয়ে দস্যু বনহুর উধাও হবার পর থেকে মিঃ মেনিলো নিখোঁজ হয়েছেন। তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক সন্ধান করা হয়েছে তবু তার কোনো পাত্তা নেই।

মিঃ হুসাইন বললেন–আপনারা জানেন না দস্যু বনহুর কত চতুর, বুদ্ধিমান। সে বিদেশী গোয়েন্দা ছদ্মবেশে আমাদেরই মধ্যে আত্মগোপন করে, আমাদের সবকিছু জেনে নিতে এবং সে সুযোগ করে নিয়ে মিস রীনাকে নিয়ে উধাও হয়েছে।

ফাংহা পুলিশপ্রধানের মুখ কালো হয়ে গেছে, তিনি বললেন এমন অপদস্থ এর পূর্বে আমরা কোনোদিন হইনি। দস্যু বনহুর একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির ছদ্মবেশে আমারদেরই মধ্যে থেকে কাজ করে গেছে, অথচ আমরা কেউ জানি না বা বুঝতেও পারিনি।

মিঃ হুসাইন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিয়ে বললেন–যাক সে পালিয়েও বাঁচতে পারেনি, এটাই আমার সান্তনা।

বললেন একজন পুলিশ অফিসার হাঁ স্যার, দস্যু বনহুর মিস রীনাকে নিয়ে তার ঘোড়াসহ গভীর ফাটলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাতে কোনো ভুল নেই।

বললেন পুলিশপ্রধান–আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন তো!

হাঁ, শুধু আমি নই আমরা কয়েকজন পুলিশ অফিসার ছিলাম পুলিশ ভ্যানে। আমরা নিজের চোখে দেখেছি, দস্যু বনহুর রীনা সহ তার জমকালো ঘোড়া নিয়ে

পর্বতময় উঁচুস্থান থেকে গভীর খাদের তলে পড়ে গেলো।

তাহলে আমরা এখন নিশ্চিন্ত, কি বলেন? বললেন পুলিশ অধিনায়ক।

হাঁ, নিশ্চিন্ত বলা যায়……বললেন মিঃ হুসাইন। দস্যু বনহুরকে তিনি নাগালের মধ্যে পেয়েও জীবিত পাকড়াও করতে সক্ষম হলেন না, তার এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো এটা তার দুঃখ।

মিঃ হুসাইন ফিরে চললেন স্বদেশ অভিমুখে।

তখন দস্যু বনহুর তার অশ্বপৃষ্ঠে ফিরে চলেছে!

*

মনিরা।

তুমি!

হাঁ।

কেন এলে?

তুমি তো সব জানো মনিরা তবু কেন আমার উপর অভিমান করো?

তাই বলে সবকিছুরই একটা সীমা আছে…..

আমি অপরাধী, এ কথা বারবার তোমার কাছে স্বীকার করেছি তবু তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না?

তুমি যদি নারী হতে, বুঝতে আমার ব্যথা কত গভীর। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো মনিরার কণ্ঠ, মনিরাকে আবেগভরে টেনে নিলো কাছে। বললো সে–মনিরা, জানি না কবে সেইদিন আসবে যেদিন তোমার পাশে নিশ্চিন্ত মনে আমি বসবাস করতে পারবো।

সত্যি তুমি এ কথা ভাবো?

ভাবি কিন্তু সমাধান খুঁজে পাই না। হয়তো আমার জীবনে সে সুযোগ আসবে না……

তুমি বড় কঠিন মানুষ, কেন তুমি স্বাভাবিক হতে পারে না? কেন তুমি আমার কাছাকাছি থাকতে পারো না? কেন তুমি নিজকে সংযত করে নাও না?

তোমার সবকথা আমি মেনে নিলাম, কিন্তু মনিরা, তুমিই বলো দেশবাসী আমাকে মেনে নেবে? তোমার কাছাকাছি থাকতে দেবে আমাকে? আমাকে সংযত হবার সুযোগ দেবে তারা বললাঃ মনিরা, প্রথমেই বলেছিলাম আমি অভিশপ্ত…… আমি তোমার জীবনের অভিশাপ……

না না, তুমি এ কথা বলো না! মনিরা স্বামীর মুখে হাতচাপা দেয়।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ওর ললাটে একে দেয় গভীর চুম্বন রেখা।

মনিরা বলে–ওগো, তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল। আমি অনেক দূরে যেতে চাই। তোমাকে নিশ্চিন্ত মনে আমি পেতে চাই…..তোমার পায়ে পড়ি আমাকে তুমি এ সাধ থেকে দূরে ঠেলে দিও না। চলো না আমরা কোথাও অনেক দূরে চলে যাই।

কিন্তু মা? মা তোমাকে যেতে দেবেন?

আমি তাকে রাজি করাবো।

বেশ, তাহলে তাই হবে। বলো তুমি কোথায় যেতে চাও?

সত্যি তুমি আমাকে নিয়ে যাবে।

তোমার এ সাধ আমি অপূর্ণ রাখতে পারি না মনিরা, তাছাড়া আমি নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমার কাছাকাছি থাকতে মন চায়……শেষ কথাগুলো বনহুর মনিরার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে।

মনিরার বুকে অনাবিল আনন্দ দোলা দিয়ে যায়। স্বামীকে সে কতদিন এত কাছাকাছি পায়নি। এ আনন্দ তার বড় সাধনার, বড় কামনার!

বনহুর বললো–কাল সন্ধ্যায় আমি আসবো, তুমি প্রস্তুত থেকো, কেমন, হাঁ, মাকে অবশ্য বলে। রাখবে যেন তিনি অমত না করেন।

না, তিনি কিছুতেই অমত করবেন না, আমি জানি।

তাহলে এখন বিদায় দাও?

দিলাম, কিন্তু মনে থাকে যেন কাল সন্ধায়

থাকবে।

আমি সব গুছিয়ে রাখবে।

রেখো। বনহুর যে পথে এসেছিলো সেইপথে বেরিয়ে যায়।

মনিরা পা বাড়ায় মামীমার কক্ষের দিকে।

তখনও রাত ভোর হয়নি।

আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে দূরের মসজিদ থেকে।

জেগে উঠলেন মরিয়ম বেগম তিনি আজানের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি একটা দিনের জন্য ফজরের নামাজ কাজা করেননি, সকাল বেলা উঠা তার অভ্যাস। বিছানা ত্যাগ করতেই মনিরা এসে দাঁড়ায় তার সম্মুখে।

মরিয়ম বেগম অবাক হন, কারণ মনিরা কোনোদিন এত ভোরে শয্যা ত্যাগ করে না, আজ কেন সে এত সকাল সকাল উঠেছে, প্রশ্নভরা চোখে তাকালেন।

মনিরা বলে–মামীমা, ও এসেছিলো

মনির এসেছিলো? মায়ের কণ্ঠ উচ্চল আনন্দে ভরে উঠে। চোখ দুটো খুশিতে জ্বলে উঠলো।

মনিরা বললো–হাঁ, এসেছিলো।

কোথায় সে?

চলে গেছে।

চলে গেলো, আমার সঙ্গে একটিবার দেখা করলো না?

আবার আসবে, তাছাড়া রাত ভোর হয়ে এসেছে, তাই সে দেরী করলো না।

আসবে? আবার আসবে মনির?

হাঁ মামীমা।

ও ভাল আছে তো?

হাঁ ভাল আছে! মামীমা, জানো সে আমাকে নিতে আসবে।

তোকে নিতে আসবে!

মামীমা, ও আমাকে নিয়ে কোথাও দূরে চলে যাবে। কিছুদিন আমরা শহরের এই কোলাহল থেকে দুরে থাকতে চাই। তুমি বারণ করো না মামীমা।

আমাকে একা ফেলে চলে যাবি?

কটা দিন বইতো নয়, আবার চলে আসবো। তোমার কাছে থাকবে মাহবুব, মাংলু, ফুলির মা তারপর সরকার সাহেব তো আছেনই। কিছু ভেবো না লক্ষী মামীমা……

আচ্ছা, তাই যেও।

সত্যি রাজি?

রাজি।

মামীমা, আমার লক্ষী মামীমা!

মনিরা সমস্ত দিন ধরে অনেক কিছু গোছগাছ করে নিলো। যা একটা সংসারের জন্য প্রয়োজন কিছু বাদ দিলো না সে নিতে।

পরদিন সন্ধ্যায় একটা গাড়ি এসে থামলো চৌধুরীবাড়ির সম্মুখে।

মনিরা তার গোছানো জিনিসপত্র নিয়ে নেমে এলো নিচে।

ড্রাইভ আসনে বসে একটা শিখ ড্রাইভার।

মনিরা এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভ আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

মনিরা উঠে বসলো পিছন আসনে।

এবার ড্রাইভার গাড়ির পিছনে মালপত্র তুলে নিলো। তারপর নিঃশব্দে গাড়ি বেরিয়ে গেলো চৌধুরীবাড়ি থেকে।

জনমুখর রাজপথ বেয়ে গাড়ি ছুটে চললো।

ড্রাইভার আর মনিরা দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের কথাবার্তা শেষ করলো।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ড্রাইভার বললো–মাকে রাজি করতে কষ্ট হয় বুঝি?

উহু, মোটেই না। জানো তোমার সঙ্গে আমি যদি গাছের নিচে গিয়ে বাস করি তাহলে মামীমা বারণ করবেন না। তোমার কথা শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছে।

জানো মনিরা, আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।

জানি অনেক দূরে।

হাঁ, অনেক দূরে অজানা দেশে।

সেখানে শুধু তুমি আর আমি, তাই না?

ঠিক তাই।

মনিরার দু’চোখে আনন্দদ্যুতি খেলে যাচ্ছে, মনে অফুরন্ত আনন্দ। আজ এত খুশি লাগছে যা সে বুঝিয়ে বলতে পারছে না। সবচেয়ে বড় আনন্দ, স্বামীর সঙ্গে সে চলেছে।

পথের দু’ধারে লাইটপোষ্টের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। ঝলমল করছে দোকানপাটগুলো, নানা বর্ণের আলোতে আলোকময় চারিদিক।

মনিরা স্বামীর গাড়িতে বসে আছে নিশ্চিন্ত মনে। সে জানে তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে ও, যেখানে থাকবে না কোনো মানুষের কোলাহল, থাকবে না হইহুল্লোড় বা জ্বালাময় পরিবেশ। নীরবে বসেছিলো মনিরা?

গাড়ি চালিয়ে চলেছে তার প্রিয়তম স্বামী দস্যু বনহুর।

গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো মনিরা, হঠাৎ ব্রেক কষার ঝাঁকুনিতে সম্বিৎ ফিরে পায় সে।

সম্মুখে একটা মেঠো পথ, সেই পথ ধরে গাড়ি চলতে শুরু করলো এবার।

মনিরা বললো–কোথায় চললে?

অনেক দূরে।

রাতে এমন মেঠো পথে….

চিন্তার কোনো কারণ নেই, ঠিক জায়গায় যাবো।

মনিরা চুপ রইলো।

কিছুদূর এগুতেই আকাশে চাঁদ উঠলো। পূর্ব দিন পূর্ণিমা গত হলেও আজও চাঁদখানা তেমনি পূর্ণই রয়েছে। ঝলমল করে উঠলো প্রান্তর।

গাড়ি হোঁচট খেয়ে খেয়ে চললেনও মনিরার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ বনহুরের দামী গাড়িখানার গদি অত্যন্ত নরম ছিলো।

বললো মনিরা–আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

বলেছি তো অচিন রাজ্যে। আচ্ছা মনিরা, কেমন লাগছে তোমার?

বেশ লাগছে।

ঝাঁকুনি সরে উঠেছো তাহলে?

তোমার গাড়ির গদি এত নরম যে, পথের ঝাঁকুনি আমাকে কাহিল করতে পারবে না।

এসো আমরা নেমে পড়ি।

কোথায়?

এই মেঠোপথে।

দস্যু বনহুরের সখ দেখছি মন্দ না? তুমি কি ছবির নায়ক হলে, তাই আমাকে নায়িকা বানিয়ে…

হাঁ তাই! জানো মনিরা, আমরা শহর ছেড়ে কতদূরে এসে পড়েছি?

না।

অনেক দূরে, এখানে কোনো সভ্যমানুষের সাক্ষাৎ পাবে না। বা কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। এটা সম্পূর্ণ নির্জন জায়গা। ঐ যে কালো বন দেখছো, ঐ কালো বনের পাশে আছে একটা কাঠের ডাকবাংলো। ঐ ডাকবাংলো বড় সুন্দর, আপাতত আমরা ঐ ডাকবাংলোয় থাকবো।

সত্যি?

হাঁ মনিরা।

আমি তো স্বপ্ন দেখছি না?

মনিরা, আমি তোমাকে কোনদিন খুশি করতে পারিনি। বলো মনিরা, তুমি কি পেলে সুখী হবে।

শুধু তোমাকে।

তাই তো এলাম এই নির্জন শালবনের পাশে। এখানে যারা বাস করে তারা সভ্য মানুষ নয়, তারা অসভ্য জংলীসাঁওতাল, ওরা কাঠ কাটে আর সেই কাঠ শহরে চালান দেয়। বড় বড় বাবুরা সেই কাঠ নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করে। জানো মনিরা, ওরা কত গরিব! এখানে এই নির্জন ডাকবাংলোয় থেকে ওদের মধ্যে আমরা দুজন মিশে থাকবো। ওদের মুখে হাসি ফোঁটাতে চেষ্টা করবো। ওরা আর আমরা মিশে যাবো একসঙ্গে, কেমন রাজি।

মনিরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে যেন।

বলে বনহুর–কি, চুপ হয়ে গেলে যে? বুঝতে পেরেছি ঐ অসভ্য জংলী মানুষগুলোকে তুমি আপন করে নিতে পারবে না, তাই না?

ছিঃ তুমি এসব কি বলছো? আমি ভাবছি অন্য কথা।

কি কথা ভাবছো মনিরা?

ভাবছি আমি কি সত্যি তোমাকে নিবিড় করে কাছে পেয়েছি। আমি কি সত্যি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। আমি কি বাস্তব জগতে আছি না কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি। ওগো, জানো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না......মনিরা স্বামীর জামাটা এটে ধরে বুকে মুখ লুকায়।

পাশে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে।

আকাশে চাঁদ হাসছে।

সম্মুখে শালবন।

চারিদিকে জ্যোছনার আলো ঝলমল করছে। মনিরা স্বামীর বুকে মুখ রেখে বলে–আমি জানতাম না মুক্ত আকাশের তলে এত আনন্দ এত শান্তি। আর আমি ফিরে যাবো না শহরের ঐ কোলাহলময় পাষাণ প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে।

মনিরা!

বলো?

জানি তুমি আমাকে কাছে পেলে কত খুশি হও।

জানো! সত্যি বলছো?

হাঁ।

তাহলে শপথ করো আমাকে স্পর্শ করে, আকাশভরা তারা আর ঐ চাঁদকে স্বাক্ষী রেখে শপথ করো, আমাকে ছেড়ে আর তুমি কোথাও যাবে না, বলো? বলো, চুপ রইলে কেন, বলো?

মনিরা, তুমি আমাকে শপথ করতে বাধ্য করো না। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে কাছে কাছে রাখতে চেষ্টা করবো। চলো এবার ঐ ডাকবাংলোতে যাই। সেখানে ফাগুয়া আমাদের জন্য ডাকবাংলোর দরজা খুলে রেখেছে।

ফাগুয়া, কে সে?

একজন জংলী সাঁওতাল! বড় ভাল লোক, ডাকবাংলো পরিষ্কার করবার জন্য আদেশ দিলো, তারপর সে যে কি খুশি তা তাদের মধ্যে গেলেই বুঝতে পারবে মনিরা! চলো, উঠো গাড়িতে।

বনহুর দরজা খুলে ধরলো।

মনিরা উঠে বসলো।

ডাকবাংলো সম্মুখে গাড়ি পৌঁছতেই চারপাশ থেকে ছুটোছুটি করে এসে জড়ো হলো জংলী সাঁওতাল নারীপুরুষ ছেলেবুড়ো সবাই।

সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে ফাগুয়া।

গাড়ি থেকে বনহুর নামতেই ফাগুয়া বললো–সালাম বাবু!

সালাম। বললো বনহুর, তারপর হেসে বললো সে–ফাগুয়া, বৌকে এনেছি, ও থাকবে তোদের

ফাগুয়া এবার মনিরাকে সালাম জানালো, বললো–বৌরাণী সালাম। তারপর সে সবাইকে সালাম করতে বললো।

সাঁওতাল সবাই বৌরাণীকে সালাম জানালো।

মনিরা খুশি হয়ে সবাইকে তার প্রতি উত্তর দিলো।

ফাগুয়া বললো–ঘরে চল বাবু। বৌকে নিয়ে ঘরে চল।

বনহুর মনিরাকে নিয়ে ডাকবাংলোয় প্রবেশ করলো।

ডাকবাংলোর চৌকিখানা ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। যেন বাসারঘর ওরা সাজিয়ে রেখেছে।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো–এসব কি হয়েছে ফাগুয়া।

ও বলিস না বাবু, করেছে হামার বেটি রুবিনা।

রুবিনা?

হ বাবু, বৌ নিয়ে আসবি শুনে রুবিনা জঙ্গল থেকে ফুল তুলে এনে সাজিয়েছে।

হাসলো বনহুর, তারপর মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো–ওরা আমাদের বাসরঘর সাজিয়েছে মনিরা।

তাই তো দেখতে পাচ্ছি।

বনহুর নিজ হাতে বিছানা পাতলো। অবশ্য মনিরা বাসা থেকে বিছানাপত্র গাড়ির পিছনে এনেছিলো। এমনকি রান্নার সরঞ্জাম সব এনেছে সে, কোনো কিছু বাদ রাখেনি। ছোট্ট একটা সংসারের জন্য যা প্রয়োজন সব এনেছে সঙ্গে।

মনিরা মামীমার দৃষ্টি এড়িয়ে ফুলির মার সঙ্গে যোগ দিয়ে এসব গুছিয়ে নিয়েছিলো। এমন কি চাল ডাল তেল লবণ সব এনেছে মনিরা।

বনহুর হেসে বললো–চমৎকার সংসার গুছিয়ে এনেছো দেখছি!

ফাগুয়া তার দু'জন লোক নিয়ে সব জিনিসপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে সাজিয়ে রাখলো। তারপর একরাশ ফলমূল এনে দিলো সে বনহুর আর মনিরাকে খেতে।

রাতে ঐ ফলমূল খেয়েই কাটাবে। ওরা মনস্থ করে নিলো।

ফাগুয়া যাবার সময় বলে গেলোবাৰু, তোদের কোনো অসুবিধা হলে জানাবি, হামি ঘরে জাগাই থাকি।

আচ্ছা, তোমরা যাও যাওয়া দরকার মনে করলে জানাবো।

চলে গেলো ফাগুয়া তার লোকদের নিয়ে।

বনহুর দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো বিছানার পাশে। মনিরা বিছানায় হাত-পা তুলে বসেছিলো। বললো বনহুর–ওরা কত মহৎ, দেখেছো মনিরা।

হাঁ, তাই দেখছি।

মনিরা!

বলো?

তোমার কেমন লাগছে?

তোমাকে বুঝিয়ে বলবার মত আমার ভাষা নেই। তোমার?

ঠিক তোমার মত! কথাটা বলে বনহুর বসলো মনিরার পাশে।

লণ্ঠনের আলোতে মনিরার মুখখানা তুলে ধরলো, ধীরে ধীরে নিজের মুখখানাকে মনিরার কাছে নিয়ে এলো।

বললো মনিরা–ছিঃ।

না, তুমি আজ আমার, একান্ত আমার.......

কবে আমি পর ছিলাম তোমার, বলো তো?

বনহুর লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে ফিরে এলো। আবেগভরা কণ্ঠে ডাকলো বনহুর–মনিরা?

স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বললো মনিরা–বলো?

কতদিন তোমাকে এত কাছে পাইনি, এমনভাবে পাইনি। আজ আমি হারিয়ে যেতে চাই তোমার মাঝে মনিরা……

[পরবর্তী বই কালো মেঘ]

Category: দস্যু বনহুর সমগ্র

পূর্ববর্তী:

« ৬.০৯ খোন্দকার বাড়ি

পরবর্তী:

৬.১১ কালো মেঘ »